HSC
একাডেমিক কোর্স

অর্থনীতি ২য় পত্র

অধ্যায় ০১ : বাংলাদেশের অর্থনীতি পরিচয়

টপিক – ০১ বাংলাদেশের অর্থনীতির ঐতিহাসিক পটভূমি

আলোচিত বিষয়বস্তু

টপিক ০১: বাংলাদেশের অর্থনীতির ঐতিহাসিক পটভূমি
টপিক ০২: বাংলাদেশের ভৌগলিক অবস্থান
টপিক ০৩: চাহিদা
টপিক ০৪: পরিবেশ
টপিক ০৫: বাংলাদেশের অর্থনীতির কাঠামো
টপিক ০৬: অবকাঠামো
টপিক ০৭: বাংলাদেশের অর্থনীতির বৈশিষ্ট্য
টপিক ০৮: বাংলাদেশের অর্থনীতির গতিধারা
টপিক ০৯: বৈশ্বিক পরিপ্রেক্ষিতে বাংলাদেশের অবস্থান এবং ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা
টপিক ১০: বহুনির্বাচনী প্রশ্ন সমাধান
টপিক ১১: সৃজনশীল প্রশ্ন সমাধান

বাংলাদেশের অর্থনীতির ঐতিহাসিক পটভূমি

This Topic is important for

MCQ	সৃজনশীল
	ক খ
	গ ঘ

বাংলাদেশের অর্থনীতির ঐতিহাসিক পটভূমি

১৯৭১ সালে মহান স্বাধীনতা ও মুক্তিযুদ্ধে বিজয় লাভের পর পৃথিবীর মানচিত্রে নতুন সংযোজন ঘটে 'বাংলাদেশ' নামক সার্বভৌম ভূখণ্ডের। এর পূর্বে এ ভূখণ্ড পূর্ব-পাকিস্তান হিসেবে ২৪ বছর ছিল পশ্চিম-পাকিস্তানের অধীনে, তারও পূর্বে সমগ্র ভারতের অন্তর্ভুক্ত থেকে ছিল ব্রিটিশ শাসন ও শোষণের অধীনে ১৯০ বছর। এখানেই ইতিহাস শেষ নয়। এ পৃথিবীতে ঠিক কবে, কখন মানুষ নামের প্রাণের সঞ্চার হয়েছে তার সঠিক ইতিহাস স্পষ্ট বা নিশ্চিতভাবে অজানা। ইতিহাসবিদ এবং প্রত্নতাত্ত্বিক গবেষকরা মানবসমাজের সূচনাকালকে তিনটি পর্বে ভাগ করেন। যেমন-প্রাগৈতিহাসিক যুগ, সুপ্ত ঐতিহাসিক যুগ এবং ঐতিহাসিক যুগ। প্রথম ও দ্বিতীয় পর্বেই মানুষ লক্ষ লক্ষ বছর অতিবাহিত করেছে। তবে ঐ সময়ে কোনো লিখিত উপকরণ না থাকায় মানুষের জ্ঞান ছিল সীমিত। তখনকার সময়ে পাথরই ছিল মানুষের খাদ্যগ্রহণের জন্য শিকার ধরার হাতিয়ার। এ পাথর দ্বারাই তারা আত্মরক্ষা করতো, আগুন জ্বালাতো। এভাবেই পরিবর্তন, বিবর্তনের মাধ্যমে বর্তমান সভ্যতার সূচনা হয়। প্রাচীন যুগে এ অঞ্চলের ভিন্ন ভিন্ন অংশ ভিন্ন ভিন্ন নামে অভিহিত ছিল। ঘন ঘন রাজনৈতিক পটপরিবর্তনে এ অঞ্চলের সীমানাও বহুবার পরিবর্তিত হয়েছে। হিমালয় হতে বঙ্গোপসাগর পর্যন্ত এ অঞ্চলের উত্তর অংশ বরেন্দ্র ও পুণ্ড্র, দক্ষিণ অংশ হরিকেল ও সমতট, পূর্ব অংশ বঙ্গাল, পশ্চিম অংশে রাঢ় ও তাম্রলিপ্তি এবং উত্তর-পশ্চিমের কিছু অঞ্চল গৌড় নামে পরিচিত ছিল।

বাংলাদেশের অর্থনীতির ঐতিহাসিক পটভূমি

আদিকাল হতে এ অঞ্চলে অনার্যরা বসবাস শুরু করে। এরপর আর্য এবং বৌদ্ধদের আগমন ঘটে। বৌদ্ধদের পর হিন্দু রাজাদের শাসন চলে। ত্রয়োদশ শতাব্দীর শুরু হতে মুসলিম উপনিবেশ শুরু হয়। মুসলমান যুগে এ অঞ্চলের নাম বাঙ্গালা বা বাংলা নামে অভিহিত হয়। তবে এক্ষেত্রে আলোচনার সুবিধার্থে ১৯৭১ সালের পূর্বে বর্তমান বাংলাদেশ নামক স্বাধীন সার্বভৌম দেশটিকে 'ভূ-খণ্ড' বলা হয়েছে।

ভূখণ্ড → ব্রিটিশ-পূর্ব শাসন ও শোষণ পদ্ধতি → ব্রিটিশ শাসনামল → পাকিস্তানি শাসনামল → বাংলাদেশ

বাংলাদেশের অর্থনীতির ঐতিহাসিক পটভূমি

ব্রিটিশ-পূর্ব শাসন ও শোষণ পদ্ধতি

সুপ্রাচীনকাল হতে এ ভূখণ্ডের জনগণের প্রধান উপজীবিকা ছিল কৃষি। বর্তমানে যে ধরনের হাল, লাঙ্গল দিয়ে জমি চাষ করা হয় তখনও সে রকম ছিল। কোনো কোনো জায়গায় হালের গরুর পরিবর্তে জমি চাষের সময় পরিবারের পুরুষ বা মহিলা সদস্যরা শ্রম দিতো। সমাজব্যবস্থা ছিল কৃষিনির্ভর। সমাজ সংগঠনের একক ছিল গ্রাম। গ্রামীণ জীবনের যে সামান্য চাহিদা তা গ্রামেই মেটাবার ব্যবস্থা ছিল। খ্রিষ্টীয় পঞ্চম শতকের কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে দুর্লভ ক্রিমিজাম (রেশম) শিল্পসহ বিভিন্ন বস্ত্রের কথা উল্লেখ রয়েছে। প্রাচীনতম গ্রন্থ চর্যাপদেও ঐ সময়ের অর্থনীতির স্বরূপ জানা যায়। সুপ্রাচীনকাল থেকেই প্রায় ১২০০ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত এরূপ কৃষিকেন্দ্রিক অর্থনীতি বিদ্যমান ছিল। প্রাচীন যুগের এ অর্থনীতিকে অনেকে আদি ও হিন্দু যুগের অর্থনীতি হিসেবে অভিহিত করেন। তখন উল্লেখযোগ্য কোনো প্রযুক্তিগত উন্নয়ন হয়নি।

বাংলাদেশের অর্থনীতির ঐতিহাসিক পটভূমি

ব্রিটিশ-পূর্ব শাসন ও শোষণ পদ্ধতি

মৌর্য যুগ হতে শুরু করে গুপ্ত যুগ, পাল যুগ, সেন যুগ বিভিন্ন সময় অতিক্রম হওয়ার পরও এ ভূখণ্ডের ভূমি ও চাষাবাদের মৌলিক কোনো পরিবর্তন হয়নি। তখনকার সময় ভূমির মালিক ছিল রাজা, জমি চাষ করার জন্য কর দিতো কৃষক। গুপ্ত যুগ কৃষিনির্ভর হলেও কুটিরশিল্প বিশেষ করে কার্পাসনির্ভর বস্ত্রে ছিল সমৃদ্ধ। সমৃদ্ধ কুটিরশিল্প ও সুদক্ষ কারুশিল্পী ছিল এ অঞ্চলের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। তখন এখানে আখ হতে চিনি উৎপাদন এবং রপ্তানি হতো। এছাড়া মৃৎশিল্প, হাতির দাঁতের শিল্প, তাম্র-কাঁসাসহ মিশ্র ধাতুশিল্পেও সমৃদ্ধ ছিল এ অঞ্চল। এছাড়া যাতায়াত ও ব্যবসা-বাণিজ্যের একমাত্র নির্ভরযোগ্য নৌ-শিল্পেও এ অঞ্চলের একটি স্থান ছিল। মসলিন এ অঞ্চলের একটি প্রাচীন বস্ত্রশিল্প এবং তার খ্যাতি ছিল বিশ্বব্যাপী। বস্ত্র ছাড়াও তখন এ অঞ্চল হতে মুক্তা, তেজপাতা কিছু কিছু কৃষিপণ্য বিদেশে রপ্তানি হতো। ঐ সময়ে দেশ-বিদেশের সাথে বিভিন্ন রকম ব্যবসায়-বাণিজ্যের সম্পর্ক ছিল বলেই বিদেশ হতে বিভিন্ন প্রকার মুদ্রা আমদানি হতো।

বাংলাদেশের অর্থনীতির ঐতিহাসিক পটভূমি

ব্রিটিশ-পূর্ব শাসন ও শোষণ পদ্ধতি

ভারতীয় উপমহাদেশে মুসলিম যুগের শাসনামল-এর প্রবাহ চিত্র :

তুর্কি শাসন (১২০৬–১২৯০) → খিলজি শাসন (১২৯০–১৩২০)
(কুতুবউদ্দীন আইবক এর মাধ্যমে সূচনা)

↓

তুঘলক শাসন (১৩২০–১৪১৩)

↓

সৈয়দ বংশ (১৪১৪–১৪৫১)

↓

লোদী বংশ (১৪৫১–১৫২৬)

↓

মোগল/মুঘল শাসন (শক্তিশালী মুঘল শাসন : বাবর – আওরঙ্গজেব : ১৫২৬ – ১৭০৭/ শেষ শাসক হিসেবে দ্বিতীয় বাহাদুর শাহ্ ১৮৫৮)

নবাবি আমল : মুঘল শাসকদের মধ্যে সম্রাট আওরঙ্গজেবের মৃত্যুর পর ভারতবর্ষে মুঘল শাসনব্যবস্থা দুর্বল হয়ে পড়ে। ১৮৫৮ সাল পর্যন্ত শিথিল মুঘল শাসনব্যবস্থা বিদ্যমান থাকলেও সম্রাট আওরঙ্গজেবের দেওয়ান ও পরবর্তীতে সুবেদার (১৭০৫) 'মুর্শিদ কুলি খাঁ' নিজেকে বাংলা প্রদেশ-এর স্বাধীন 'নবাব' হিসেবে নবাবি শাসনের সূত্রপাত করেন ১৭০৭ সালে। স্বাধীন নবাবি শাসনামল বিদ্যমান ছিল ১৭৫৭ সাল পর্যন্ত।

বাংলাদেশের অর্থনীতির ঐতিহাসিক পটভূমি

ব্রিটিশ-পূর্ব শাসন ও শোষণ পদ্ধতি

১২০০ হতে ১৭৫৭ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত মধ্য যুগের অর্থনীতিতে এ অঞ্চলে মুসলিম যুগের শাসনামল লক্ষ্য করা যায়। ইতিহাসে মুসলিম শাসনামলকে স্বর্ণযুগ হিসেবে বিবেচনা করা হয়। এসময়ে নৌ-শিল্পের কিছুটা প্রসার ঘটে। রণতরীসহ পালতোলা যাত্রীবাহী বিভিন্ন ধরনের নৌকা এসময় তৈরি হয়েছিল। চট্টগ্রাম বন্দরের উন্নয়নও এসময় হয়েছিল। ১৩০১ খ্রিষ্টাব্দে শামছুদ্দিন ফিরোজ শাহ বিনিময় প্রথা রহিত করে সোনারগাঁয়ে প্রথম মুদ্রার প্রচলন করেন। বস্তিয়ার-এর বঙ্গ বিজয় থেকে শুরু করে ইংরেজ রাজত্ব প্রতিষ্ঠা পর্যন্ত এ ভূখণ্ডের অর্থনীতির মৌলিক কোনো পরিবর্তন হয়নি। মধ্যযুগে শেরশাহের আমলে সমগ্র রাজত্বকে কতগুলো সরকার এবং পরগণায় বিভক্ত করা হয়। তখন জমির উৎপাদিত ফসলের এক-চতুর্থাংশ খাজনা হিসেবে কৃষকরা দিতো। বাদশা আকবরের আমলে ১৫৮২ খ্রিষ্টাব্দে রাজা টোডরমল এ অঞ্চলের রাজস্ব বন্দোবস্তের তালিকা প্রস্তুত করেন।

বাংলাদেশের অর্থনীতির ঐতিহাসিক পটভূমি

ব্রিটিশ-পূর্ব শাসন ও শোষণ পদ্ধতি

মোগল বাদশাহ'র আমলে জায়গিরদাররা ছিল প্রকৃতপক্ষে রাজস্ব আদায়ের ক্ষেত্রে ইজারাদার। তবে এ অঞ্চল নদীমাতৃক ছিল বলে এখানে দীর্ঘকাল কোনো নির্দিষ্ট দাবি বহাল রাখা যেত না। তাই সামান্য ইজারাদারি প্রথা কোনো কোনো ক্ষেত্রে প্রচলিত ছিল। দিল্লির বাদশাহী শাসন যখন ক্রমে দুর্বল হয়ে পড়লো তখন উপমহাদেশে অন্যান্য অঞ্চলের' ন্যায় এ ভূখণ্ডেও রাজস্ব আদায়ের ক্ষেত্রে ইজারা প্রথা ব্যাপকভাবে চালু হতে থাকলো। তখন প্রভাবশালী সরকারি কর্মকর্তা, রাজস্ব আদায়কারীরাও জমিদার হিসেবে নিজেদের ঘোষণা করতেন। জমিদাররা শতকরা দশভাগ রাষ্ট্রকে সেলামি দিতো। এ ইজারা চলতে থাকে বংশানুক্রমে। সে সময় সমাজব্যবস্থার ওপর দৃঢ়ভাবে চেপে ছিল নানান স্তরে বিন্যস্ত সামন্ত প্রভুর দল।

বাংলাদেশের অর্থনীতির ঐতিহাসিক পটভূমি

ব্রিটিশ-পূর্ব শাসন ও শোষণ পদ্ধতি

মোগল আমলের কিছু পূর্ব থেকেই ব্যবসায়-বাণিজ্য উপলক্ষ্যে বাংলার মাটিতে বিদেশি বণিকদের আনাগোনা শুরু হয়। ওলন্দাজ, ইংরেজ, ফরাসি বণিকরা এ ভূখণ্ডে ব্যবসার ক্ষেত্রে সূত্রপাত ঘটায়। বৈদেশিক বাণিজ্যের কারণে তখন প্রচুর পরিমাণ সোনা, রুপা আমদানি হওয়ায় এখানকার নবাব দিল্লির বাদশাকে নগদ অর্থে সেলামি দিতো। সম্রাট জাহাঙ্গীর মৃত্যুর পূর্বে নির্দেশ দেয় যে, এ অঞ্চলে প্রত্যেক নতুন সুবেদার নিয়োগের সময় সম্রাটকে দশ লক্ষ টাকা সেলামি দিতে হবে। এ ছাড়াও বিভিন্ন সময়ে সম্রাট সুবেদারের কাছ থেকে প্রচুর অর্থ আদায় করতেন। ১৬৭৮ খ্রিষ্টাব্দে সুবেদার শায়েস্তা খান সম্রাটকে তিন লক্ষ টাকার উপহার ও চার লক্ষ টাকার মণি-মাণিক্য দিয়েছিলেন। ১৬৮০ খ্রিষ্টাব্দে সম্রাট শায়েস্তা খাঁর
কাছ থেকে তিন লক্ষ টাকা ঋণ নেয়, সুবেদার সে টাকা আর কোনোদিন ফেরত পায়নি। এসব কিছুই ছিল নির্ধারিত দেয় রাজস্বের উপরি। তারপরও সুবেদার ব্যক্তিগতভাবে প্রচুর অর্থ সঞ্চয় করতেন। শায়েস্তা খাঁ আঠারো বছর সুবেদারি করে নয় কোটি টাকা সঞ্চয় করেছিলেন। খাঁন জাহান করেছিলেন এক বছরে দুই কোটি টাকা। শায়েস্তা খাঁর আমলে ১ টাকায় ৮ মণ চাল পাওয়া গিয়েছিল।

বাংলাদেশের অর্থনীতির ঐতিহাসিক পটভূমি

বিদেশি বণিকদের এ ভূখণ্ডে আগমন

বিদেশি বণিকদের মধ্যে সর্বপ্রথম এ ভূখণ্ডে আসে পর্তুগিজরা। পর্তুগিজ নাবিক ভাস্কো-দা-গামা (Vasco-da-Gama) ১৪৯৮ সালে ভারতবর্ষের পশ্চিম উপকূলে কালিকট বন্দরে উপস্থিত হন (২৭ মে)। এরপর পেড্রো আলভারেজ কাব্রাল (Pedro Alvarez Cabral) ১৫০০ খ্রিষ্টাব্দে ১৩টি নৌবহর নিয়ে ভারতবর্ষে আগমন করেন। ফ্রান্সিসকো-ডি-আলমিডা (Francisco-de-Almeida (১৫০৫-১৫০৯) ছিলেন ভারতবর্ষে প্রথম পর্তুগিজ প্রতিনিধি (Viceroy)। তাঁর পর আলফানসো আলবুকার্ক (Alfanso Albuquerque) গভর্নর হয়ে ভারতে আসেন। তিনি গভর্নরদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ এবং ভারতে পর্তুগিজ শক্তির প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা।*। ১৫১৭ খ্রিষ্টাব্দে 'জাও-ডি-সিলভিয়া' নামক একজন পর্তুগিজ সেনাপতি নৌবহর নিয়ে চট্টগ্রামে আগমন করেন। ১৫৩৮ খ্রিষ্টাব্দে পর্তুগিজরা চট্টগ্রাম এবং সপ্তগ্রামে বাণিজ্যকুঠি নির্মাণের অনুমতি লাভ করে। ১৫৭৯ খ্রিষ্টাব্দে সম্রাট আকবরের অনুমতিতে হুগলিতে স্থায়িভাবে বাণিজ্যকুঠি স্থাপন করে। এরপরই তাদের ব্যবসা-বাণিজ্য উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেতে থাকে। পর্তুগিজদের পর আসে ওলন্দাজরা। ১৬০২ খ্রিষ্টাব্দে তারা 'ইউনাইটেড ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি' (United East India Company) গঠন করে। সম্রাট জাহাঙ্গীরের সময় ওলন্দাজরা চুঁচুড়ায় প্রথম বাণিজ্যকুঠি নির্মাণ করে। ১৬১৫ খ্রিষ্টাব্দে প্রথম ওলন্দাজ জাহাজ এ ভূখণ্ডে নোঙর করে।

বাংলাদেশের অর্থনীতির ঐতিহাসিক পটভূমি

বিদেশি বণিকদের এ ভূখণ্ডে আগমন

১৬৩২ খ্রিষ্টাব্দে পর্তুগিজ অধিকৃত হুগলির পত্তন হয়। ১৬৪১ খ্রিষ্টাব্দে মালাক্কা অধিকার করেন এবং ১৬৫৮ খ্রিষ্টাব্দে পর্তুগিজদের সিংহল হতে বিতাড়িত করেন। ভারতের বিপুল ঐশ্বর্য সম্বন্ধে র‍্যাল্ফ ফীচ (Ralph Fitch), জন মিলডেন্হল্ (John Mildenhall) প্রমুখ ইংরেজ পর্যটকের বর্ণনায় ও পর্তুগিজ এবং ওলন্দাজদের প্রাচ্য অভিযান ইংরেজ বণিকদেরকে উৎসাহী করে তোলে। এ লক্ষ্যে ১৬০০ খ্রিষ্টাব্দে 'East India Company' নামে একটি বণিক সংঘ গঠন হয়, ১৬০৮ খ্রিষ্টাব্দে ভারতে কুঠি স্থাপনের জন্য ক্যাপ্টেন হকিন্স রাজা প্রথম জেমসের সুপারিশ পত্র নিয়ে মুঘল সম্রাট জাহাঙ্গীরের দরবারে উপস্থিত হন। ১৬৩৮ খ্রিষ্টাব্দে ইংরেজরা স্বাধীনভাবে ব্যবসায় করার সুযোগ পায় এবং ১৬৫১ খ্রিষ্টাব্দে ইংরেজরা প্রথম কারখানা স্থাপন করে।

বাংলাদেশের অর্থনীতির ঐতিহাসিক পটভূমি

ব্রিটিশ শাসনামল (১৭৫৭-১৯৪৭ খ্রি.)

১৭৫৭ সালে পলাশীর যুদ্ধে জয়লাভের পর এ অঞ্চলের দেওয়ানি লাভ করে ইংরেজ কোম্পানি। দেওয়ানি লাভের পূর্বে তারা ব্যবসায় করে মুনাফা ইংল্যান্ডে পাঠিয়ে দিতো। দেওয়ানি এবং রাজনৈতিক ক্ষমতা লাভের পর তাদের মুনাফার সুযোগ আরও বৃদ্ধি পায়। সে সময়কার এ অঞ্চলের রাজস্বের একটি চিত্র নিম্নে তুলে ধরা হলো :

সন	আমল	এ ভূখণ্ডের রাজস্বের পরিমাণ (লক্ষ টাকায়)
১৫৮২	টোডরমল	১০৬.৯৩
১৭২৮	সুজা খাঁ	১৪২.৪৬
১৭৯০	ব্রিটিশ কোম্পানি	২২০.০০

বাংলাদেশের অর্থনীতির ঐতিহাসিক পটভূমি

ব্রিটিশ শাসনামল (১৭৫৭-১৯৪৭ খ্রি.)

কোম্পানি রাজস্ব আয় আদায় করতো কিছু ঠিকাদারের মাধ্যমে। এ ঠিকাদাররা এদেশের চাষিদের কাছ থেকে যথাসাধ্য চেষ্টা করে রাজস্ব আদায় করতো এবং অর্থ অংকে স্ফীত হতো। তাদের রাজস্ব আদায়ের জুলুম অত্যাচারে এ অঞ্চলের অনেক কৃষক ভিটে-মাটি ছাড়া হলো। ইংরেজ শাসনের গোড়ার দিকে যে ফকির ও সন্ন্যাসী বিদ্রোহ এ অঞ্চলে, বিশেষ করে ময়মনসিংহে ছড়িয়ে পড়েছিল, সেই বিদ্রোহের ফকির ও সন্ন্যাসীরা ছিল মূলত ভিটে-মাটি থেকে উচ্ছেদকৃত কৃষক। তখন ভেরেলেস্ট (১৭৬৭-৬৯ খ্রি.) ও কার্টিয়ার (১৭৬৯-৭২ খ্রি.) পর্যায়ক্রমে বঙ্গদেশের গভর্নর এবং মীর জাফরের পুত্র 'নাজিম-উদ্-দৌলা' (১৭৬৫-৬৭ খ্রি.) নায়েব ছিলেন। ইংরেজরা বাংলার দেওয়ানি গ্রহণের পর দ্বৈতশাসনের অত্যাচারে, কোম্পানির শোষণে শিল্প ও ব্যবসা-বাণিজ্য ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এছাড়াও ১৭৬৮ সালে অনাবৃষ্টির কারণে ফসল ভালো না হওয়ায় ১৭৬৯ সালে দুর্ভিক্ষ শুরু হয়। ১৭৭০ সনে (বাংলা ১১৭৬ সাল) সমগ্র বাংলায় দুর্ভিক্ষ চরম আকার ধারণ করে। এ দুর্ভিক্ষে প্রায় এক-তৃতীয়াংশ লোক মৃত্যুবরণ করেছিল, প্রায় ৩৩ ভাগ জমি অনাবাদিতে রূপান্তরিত হয়। তখন টাকায় এক মণ চালের স্থলে তিন সের পাওয়া গিয়েছিল। অনাহারজনিত মৃত্যুর সংখ্যা দাঁড়ায় প্রতি ১৬ জনে ৬ জন। প্রায় এক দশক এ দুর্ভিক্ষের চরম ফল সমাজজীবনে ভোগ করতে হয়। এ দুর্ভিক্ষ ছিয়াত্তরের মন্বন্তর নামে পরিচিত। এ সময়ে এক-তৃতীয়াংশ লোক প্রাণ হারায়।

বাংলাদেশের অর্থনীতির ঐতিহাসিক পটভূমি

ব্রিটিশ শাসনামল (১৭৫৭-১৯৪৭ খ্রি.)

ইংরেজরা যখন এদেশে আসে তখন অর্থনীতিতে কুটিরশিল্প গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করেছিল। প্রথম দিকে ইংরেজরা সস্তায় কুটিরশিল্পজাত পণ্য কিনে ইংল্যান্ডে রপ্তানি করতো, ইংল্যান্ডের শিল্পজাত পণ্য উচ্চমূল্যে কৃষকদের কাছে বিক্রি করতো। এতে কৃষকরা ক্ষতিগ্রস্ত হলেও কোনো রকমে টিকেছিল। ১৭৯৩ খ্রিষ্টাব্দে লর্ড কর্নওয়ালিস তদানীন্তন অবিভক্ত বাংলা প্রদেশে 'চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত' প্রবর্তন করার ফলে মুষ্টিমেয় ধনী জমিদারগণ অনেক লাভবান হলেও ব্যাপকহারে দরিদ্র কৃষক প্রজারা অবর্ণনীয় দুঃখ-কষ্ট ও দমন-পীড়নের শিকার হয়েছিল। কিন্তু চরম আঘাত আসলো ১৮১৩ সালে হাউস অব কমন্স-এ ভারত হতে ইউরোপে পণ্য রপ্তানি নিষিদ্ধ করে আইন পাস, কিছু পণ্যের ওপর উচ্চহারে শুল্ক আরোপ এবং ইংল্যান্ডের শিল্পবিপ্লবের পর। শিল্পবিপ্লবের ফলশ্রুতিতে ইংল্যান্ডে বয়নশিল্প ও বস্ত্রশিল্পের প্রসার ঘটে। তখন এ ভূখণ্ড হতে আমদানিকৃত কাপড়ের ওপর চড়া শুল্ক ধার্য করলো, পরবর্তীতে তাঁতশিল্পসহ অন্যান্য কুটিরশিল্প জোর করে ধ্বংস করা হলো। এ অঞ্চলের তাঁতিদের বুড়ো আঙ্গুল কেটে দেয়ার ইতিহাস সুবিদিত ধারণা। উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে ইংরেজরা নীলচাষ শুরু করে। নীল চাষাবাদের কাজে জনগণকে জোর করে বাধ্য করা হলো। ফলে কৃষকরা বাড়ি ছাড়তে বাধ্য হয়। ফরায়েজি আন্দোলনের নেতা দুদু মিয়া এর বিরুদ্ধে আন্দোলন করেন।

ইংরেজ শাসনামলে এ অঞ্চলের মানুষের মধ্যে শিক্ষার কিছুটা প্রসার ঘটেছিল। সেই শিক্ষা ইংরেজদের মতোই শোষণ ও নেতৃত্বের অনুসারী শ্রেণি তৈরিতে ভূমিকা রেখেছে। পরবর্তীতে এ শিক্ষিত জনগণই ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনে ধীরে ধীরে জনগণকে সংঘটিত করে।

বাংলাদেশের অর্থনীতির ঐতিহাসিক পটভূমি

পাকিস্তান শাসনামল (১৯৪৭-১৯৭১ খ্রি.)

১৪ আগস্ট ১৯৪৭ সালে নতুন আশা ও উদ্দীপনা নিয়ে দ্বি-জাতিতত্ত্বের ভিত্তিতে ইংরেজ আধিপত্য থেকে মুক্ত হলো পাকিস্তান। সবাই ভেবেছিল, প্রায় দু'শ বছরের গ্লানি ও ভয়াবহতা ভুলে গিয়ে প্রগতি ও সমৃদ্ধির দিকে এগিয়ে যাবে, মানুষ সুখের মুখ দেখবে। কিন্তু পাকিস্তানের ২৪ বছরের ইতিহাসের দিকে তাকালে দেখা যায়, সামাজিক, অর্থনৈতিক, শিক্ষা ও সংস্কৃতি, ব্যবসায়-বাণিজ্য, কৃষি, শিল্প প্রভৃতি সবক্ষেত্রে সরকারি নীতি ছিল পশ্চিম-পাকিস্তানের অনুকূলে। এ ভূখণ্ডে তথা পূর্ব-পাকিস্তানে পাট, তুলাসহ অন্যান্য কৃষিপণ্য সবই উৎপাদিত হতো। রাষ্ট্রীয় আয়ের উৎসস্থল ছিল এ অঞ্চল তথা পূর্ব-পাকিস্তান। কিন্তু শিল্পের উন্নয়ন ও উৎপাদন সবই ছিল পশ্চিম-পাকিস্তানে। ব্রিটিশ শাসনামলের মতো পাকিস্তানিরাও এদেশ হতে শিল্পের কাঁচামাল সস্তায় ক্রয় করে শিল্পোৎপাদিত দ্রব্য চড়া দামে এখানে বিক্রি করতো। ফলে ২৪ বছরেও এদেশের মানুষ শোষণের হাত থেকে রক্ষা পায়নি। তবে, ১৯৫০ সালে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত বা জমিদারি প্রথা বিলুপ্ত হওয়ার মাধ্যমে সরকারকে নির্ধারিত হারে খাজনা প্রদান সাপেক্ষে কৃষকগণই জমির প্রকৃত মালিক হিসেবে ভোগ-দখল এবং মালিকানা হস্তান্তরের প্রকৃত ক্ষমতা লাভ করে।

বাংলাদেশের অর্থনীতির ঐতিহাসিক পটভূমি

পাকিস্তান শাসনামল (১৯৪৭-১৯৭১ খ্রি.)

পূর্ব-পাকিস্তান তথা বাংলাদেশের সাথে পশ্চিম-পাকিস্তানের অর্থনৈতিক বৈষম্য ও শোষণের তুলনামূলক চিত্র:

১। ভৌগোলিক ব্যবধান: পূর্ব-পাকিস্তান ও পশ্চিম-পাকিস্তানের মধ্যে ভৌগোলিক দূরত্ব প্রায় ১৬০০ কিলোমিটার বা ১০০০ মাইল। দুটো অঞ্চলের মাঝে অন্য একটি স্বাধীন দেশ-ভারত।

২। জনসংখ্যা ও প্রদেশ: পশ্চিম-পাকিস্তানের চারটি প্রদেশ; যথা- পাঞ্জাব, সিন্ধু, বেলুচিস্তান (Balochistan) এবং উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ (North-West Frontier). পূর্ব-পাকিস্তান হলো পাকিস্তানের পঞ্চম প্রদেশ। কিন্তু পাকিস্তানের মোট জনসংখ্যার ৫৪% হলো পূর্ব-পাকিস্তানে অথচ পশ্চিম-পাকিস্তানের পাঞ্জাব প্রদেশ সমগ্র পাকিস্তানের কর্তৃত্বের দায়িত্ব গ্রহণ করে।

৩। কৃষিক্ষেত্র: পূর্ব-পাকিস্তান ছিল কৃষিতে উদ্বৃত্তাঞ্চল অথচ পশ্চিম-পাকিস্তানে তখন ঘাটতি। পূর্ব-পাকিস্তানে প্রধান উৎপাদিত পণ্য পাট (তখন বৈদেশিক মুদ্রার ৭০ ভাগ আসতো এ খাত হতে), পশ্চিম-পাকিস্তানে ছিল তুলা। ১৯৬৪-৬৫ এর হিসাব অনুযায়ী পূর্ব-পাকিস্তানের মোট উৎপাদনের ৫৮ ভাগ এবং পশ্চিম-পাকিস্তানের ৪০ ভাগ কৃষির অবদান।

বাংলাদেশের অর্থনীতির ঐতিহাসিক পটভূমি

পাকিস্তান শাসনামল (১৯৪৭-১৯৭১ খ্রি.)

৪। ব্যাংকিং ও অর্থায়নের নিয়ন্ত্রণ: ১৯৪৭ এ দেশ বিভাজনের পর মুসলিম মালিকানাধীন ব্যাংকসমূহ বোম্বে হতে করাচিতে (পাকিস্তানের প্রথম রাজধানী) স্থানান্তরিত হয়। পূর্ব-পাকিস্তানে যে বিনিয়োগ হয় তা আসে পশ্চিম-পাকিস্তান হতে। আন্তর্জাতিকভাবে তখন চাহিদা ক্রমহ্রাসমান হওয়া সত্ত্বেও পূর্ব-পাকিস্তানে বিনিয়োগ হয়-পাট ও পাটজাতদ্রব্য উৎপাদনে। পশ্চিম-পাকিস্তানের আদমজি পরিবার নারায়ণগঞ্জে পৃথিবী বিখ্যাত পাট প্রক্রিয়াজাতকরণ কারখানা স্থাপন করে।

৫। জাতীয় ও মাথাপিছু আয় ১৯৪৯-৫০ সালে পূর্ব ও পশ্চিম-পাকিস্তানে মাথাপিছু আয় ছিল যথাক্রমে ৩০৫ টাকা ও ৩৩০ টাকা।**

১৯৪৯-৫০ সাল হতে ১৯৬৯-৭০ সময়ে তৎকালীন পূর্ব-পাকিস্তানের মাথাপিছু আয় বছরে ০.৭ ভাগ হারে বৃদ্ধির লক্ষ্যমাত্রা থাকলেও তা ০.৩ ভাগ হারে কমতে শুরু করে। অথচ পশ্চিম-পাকিস্তানে এসময়ে তা ২ ভাগ হারে বৃদ্ধি পায়। ১৯৬৪-৬৫ সালে পূর্ব-পাকিস্তানের GNI ছিল ১৯৯৯ টাকা, পশ্চিম-পাকিস্তানে তা ২৩৭৯ টাকা। ১৯৬৯-৭০ সালে পূর্ব-পাকিস্তানের মাথাপিছু আয় ছিল ৩৩৯ টাকা কিন্তু পশ্চিম-পাকিস্তানে তখন তা ছিল ৫০০ টাকা।

বাংলাদেশের অর্থনীতির ঐতিহাসিক পটভূমি

পাকিস্তান শাসনামল (১৯৪৭-১৯৭১ খ্রি.)

৬। নিয়োগ বা কর্মসংস্থান দেশ বিভাজনের পর পূর্ব-পাকিস্তানে উচ্চ পদস্থ প্রায় বেশিরভাগ কর্মকর্তা (গভর্নর জেনারেলসহ) পশ্চিম-পাকিস্তানি জনগণ বা ভারত থেকে আগত বিহারী শরণার্থী (refugees) যারা পাকিস্তানের নাগরিকত্ব গ্রহণ করেছে তাদের দ্বারা পূরণ করা হয়েছে। অথচ পূর্ব-পাকিস্তানের জনগণের যোগ্যতা থাকা সত্ত্বেও উচ্চ পদস্থ পদে আসীন হতে পারেননি, এরা ছিল শুধু প্রান্তিক শ্রেণির কর্মচারী।

পাকিস্তানের ২৪ বছরের ইতিহাসে অর্থ ও প্রতিরক্ষা খাতে উচ্চ পদসমূহ, পরিকল্পনা কমিশনের চেয়ারম্যান, কর্পোরেশনের প্রধান পদসমূহ প্রভৃতি পশ্চিম-পাকিস্তানের দখলে ছিল এমনকি পূর্ব-পাকিস্তান অংশেরও এ পদসমূহ তাদের নিয়ন্ত্রণে ছিল।

বাংলাদেশের অর্থনীতির ঐতিহাসিক পটভূমি

পাকিস্তান শাসনামল (১৯৪৭-১৯৭১ খ্রি.)

৭। আন্তঃপ্রদেশ বাণিজ্য বৈষম্য : পূর্ব-পাকিস্তান হতে পশ্চিম-পাকিস্তানে এবং পশ্চিম-পাকিস্তান হতে পূর্ব-পাকিস্তানে আন্তঃপ্রদেশে রপ্তানির ক্ষেত্রেও বৈষম্য ছিল। যেমন : (কোটি টাকায়)

অর্থবছর	পূর্ব-পাকিস্তান হতে পশ্চিম-পাকিস্তানে রপ্তানি	পশ্চিম-পাকিস্তান হতে পূর্ব-পাকিস্তানে রপ্তানি
১৯৪৮--৪৯	১.৮৮	১৩.৭৬
১৯৬০—৬১	৩৫.৫৯	৮০.০৫
১৯৬৭—৬৮	৭৭.৯০	১২১.৬০

Ref : Pakistan Economy Survey 1968–69

পাকিস্তান আমলে গৃহীত তিনটি পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় বৈষম্যের চিত্র :

উন্নয়ন ব্যয় বরাদ্দ (১৯৫৫—৭০) (কোটি টাকায়)

পরিকল্পনা ও সময়	পূর্ব-পাকিস্তান (বর্তমান বাংলাদেশ)	পশ্চিম-পাকিস্তান (বর্তমান পাকিস্তান)	মোট বরাদ্দে পূর্ব-পাকিস্তানের অংশ (%)
প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা (১৯৫৫—৬০)	৩৩৬	৭২২	৩২
দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা (১৯৬০—৬৫)	৯৭০	১৮৬০	৩৪
তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা (১৯৬৫—৭০)	১৬৭০	২৬১০	৩৯
মোট	২৯৭৬	৫১৯২	৩৭

Ref: East Pakistan Planning Department : Disparities between East Pakistan and West Pakistan.

বাংলাদেশের অর্থনীতির ঐতিহাসিক পটভূমি

পাকিস্তান শাসনামল (১৯৪৭-১৯৭১ খ্রি.)

৮। প্রবৃদ্ধির হার: ১৯৪৭ সালে স্বাধীনতা অর্জনের পর অনেকেই ভেবেছিল পাকিস্তানের দুই খণ্ড একে অপরের বাজার হিসেবে ব্যবহৃত হয়ে প্রবৃদ্ধি হার বৃদ্ধির মাধ্যমে উন্নয়নের চাকাকে এগিয়ে নিয়ে যাবে। কিন্তু অর্থনৈতিক বৈষম্য বৃদ্ধির কারণে তা অর্জিত হয়নি। GNP এর প্রবৃদ্ধির হার ১৯৪৯-৫০ সালে পূর্ব অংশে ১.৭%, পশ্চিম অংশে ৩.৬% যা ১৯৬৪-৬৫ সালে দাঁড়ায় যথাক্রমে ৪.২% ও ৬.২%।

বাংলাদেশের অর্থনীতির ঐতিহাসিক পটভূমি

পাকিস্তান শাসনামল (১৯৪৭-১৯৭১ খ্রি.)

৯। অন্যান্য ক্ষেত্র : (ক) পূর্ব-পাকিস্তান মোট রপ্তানির ৭০% পণ্যদ্রব্য প্রস্তুত করলেও প্রাপ্ত আয়ের মাত্র ২৫% গ্রহণ করতে পেরেছে।

(খ) ১৯৪৮ সালে পূর্ব-পাকিস্তানে কাপড়ের কল ছিল ১১টি, পশ্চিম-পাকিস্তানে ৯টি। ১৯৭১ সালে পূর্ব-পাকিস্তানে বৃদ্ধি পেয়ে ২৬টি হলেও পশ্চিম-পাকিস্তানে হয় ১৫০টি। বিনিয়োগের বেশিরভাগ ছিল পশ্চিম-পাকিস্তানকেন্দ্রিক।

(গ) পাকিস্তানের বিখ্যাত অর্থনীতিবিদ মাহবুবুল হক-এর হিসাব অনুযায়ী পূর্ব-পাকিস্তান রপ্তানি আয়ে উদ্বৃত্ত ভোগ করলেও এ উদ্বৃত্ত পশ্চিম-পাকিস্তানে স্থানান্তর হতো। প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার পূর্বে বার্ষিক ২১০ মিলিয়ন অর্থ পশ্চিম-পাকিস্তানে স্থানান্তর করতো। প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাকালে তা ১০০ মিলিয়ন ছিল। উন্নয়ন বাজেটের ৬২ ভাগ পশ্চিম-পাকিস্তানে, ১৭ ভাগ পূর্ব-পাকিস্তানে এবং ২১ ভাগ অব্যবহৃত ছিল প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায়।

(ঘ) ১৯৫০–৫১ হতে ১৯৫৯–৬০ এ দশ বছরে পূর্ব-পাকিস্তানে বৈদেশিক সাহায্য এসেছিল ৯৩ কোটি টাকা অথচ পশ্চিম-পাকিস্তানে এ সময়ে সাহায্য গ্রহণ করেছে ৪০৮ কোটি টাকা।

(ঙ) ১৯৫০–৫১ হতে ১৯৬৯–৭০ এ সময়ে পূর্ব ও পশ্চিম-পাকিস্তানের রপ্তানির পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ২৩৩০.৩ ও ১৯৪৭.৬ কোটি টাকা এবং আমদানির পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ১৯২৬.১ ও ৪১৯১.৮ কোটি টাকা।

(চ) পূর্ব-পাকিস্তান হতে পশ্চিম-পাকিস্তান ২.৬ বিলিয়ন ডলার সম্পদ পাচার করে।

(ছ) ১৯৭০ সালে পূর্ব-পাকিস্তানে প্রলয়ঙ্করী ঘূর্ণিঝড়ে প্রায় ৫ লক্ষ লোক নিহত হয়। তখন যে সাহায্য আসে তাও পশ্চিম-পাকিস্তানিরা আত্মস্যাৎ করে।

(জ) দ্বিতীয় ও তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার ক্ষেত্রেও যথাক্রমে মোট ব্যয়ের মাত্র ৩১% ও ৩৫% পূর্ব-পাকিস্তানের জন্য ব্যয় করা হয়।

(ঝ) পশ্চিম-পাকিস্তানে বেসরকারি বিনিয়োগ যথেষ্ট সরকারি পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করলেও পূর্ব-পাকিস্তান ছিল এক্ষেত্রে উপেক্ষিত।

(ঞ) পশ্চিম-পাকিস্তানের ২২ পরিবারের হাতে সম্পদের বেশির ভাগ চলে যেতো। আর পূর্ব-পাকিস্তানিরা দরিদ্র থেকে আরো দরিদ্রে পরিণত হতো।

ফলশ্রুতিতে, পাকিস্তানি শাসনামলের শোষণ ও নির্যাতনের বিরুদ্ধে এ ভূখণ্ডের মানুষ আন্দোলন সংগ্রামে অবতীর্ণ হয়। ২৫ মার্চ ১৯৭১ তারিখে স্বাধীনতার আন্দোলন শুরু হয় এবং দীর্ঘ নয় মাস যুদ্ধ করার পর ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর বাংলাদেশ স্বাধীন হয়।

বাংলাদেশের অর্থনীতির ঐতিহাসিক পটভূমি

বাংলাদেশ ও পাকিস্তানের তুলনামূলক চিত্র

পূর্ব ও পশ্চিম-পাকিস্তানের মধ্যে অর্থনৈতিক বৈষম্যই ছিল স্বাধীনতা সংগ্রামের অন্যতম ভিত্তি। সরকারি ও বেসরকারি খাতের সমন্বিত উদ্যোগ, সামাজিক সমস্যা সমাধানে নানা ধরনের উদ্ভাবনী উদ্যোগ যেমন-ক্ষুদ্র ঋণ, শিক্ষা, স্বাস্থ্যসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে সরকারের সহায়ক নীতি; পাকিস্তানের মতো এখানে গোষ্ঠীভেদে দ্বন্দ্ব-সংঘাত এবং রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা নেই। ২০২১ সাল, বাংলাদেশ স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উৎসব উদ্যাপন করছে। সেই পাকিস্তানের চেয়ে অর্থনৈতিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে প্রায় সব সূচকে ইতোমধ্যে এগিয়ে গেছে বাংলাদেশ। যেমন:

গত ৫০ বছরে অর্থনীতির আকারের দিক থেকে পাকিস্তানকে ছাড়িয়ে গিয়েছে বাংলাদেশ। ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের GDP পাকিস্তান অপেক্ষা ৬০% কম ছিল; ২০২৩ সালে বাংলাদেশের GDP পাকিস্তান অপেক্ষা ৮০% বৃদ্ধি পেয়েছে।

২০১৬ সালে প্রথমবারের মতো পাকিস্তানকে মাথাপিছু GDP-তে পেছনে ফেলে বাংলাদেশ। সে বছর বাংলাদেশের মাথাপিছু GDP বেড়ে দাঁড়ায় ১৬৫৯ মার্কিন ডলার, পাকিস্তানের ছিল ১৪৬৮ মার্কিন ডলার। এরপর আর পাকিস্তান বাংলাদেশকে ছাড়াতে পারেনি। সর্বশেষ ২০২৩ সালে বাংলাদেশের মাথাপিছু GDP ২৬২১ মার্কিন ডলার, পাকিস্তানের ১৪৭১ মার্কিন ডলার এবং ভারতের ২৬১২ মার্কিন ডলার (টানা ৪ বছর ধরে ভারতের ওপরে বাংলাদেশ)। মেরে অভীচ) এলাকার সংকট তারক

নারীর ক্ষমতায়নে এগিয়ে বাংলাদেশ। বাংলাদেশের কর্মক্ষম মানুষের মধ্যে ৩৫ শতাংশই নারী। ভারত ও পাকিস্তানে শ্রমশক্তিতে যথাক্রমে ২৩ শতাংশ ও ২০ শতাংশ নারী।

বাংলাদেশের অর্থনীতির ঐতিহাসিক পটভূমি

বাংলাদেশ ও পাকিস্তানের তুলনামূলক চিত্র

অন্যান্য সূচকেও এগিয়েছে বাংলাদেশ। রপ্তানি আয়ের দিক থেকেও পাকিস্তানের চেয়ে বাংলাদেশ এগিয়ে আছে। গত ২০২২-২৩ অর্থবছরে বাংলাদেশ ৫৫৫৬ কোটি মার্কিন ডলার রপ্তানি আয় করেছে, পক্ষান্তরে পাকিস্তানের রপ্তানি আয় ছিল ৩৮৬০ কোটি মার্কিন ডলার। ফেব্রুয়ারি ২০২৪ এ বাংলাদেশে মূল্যস্ফীতি ছিল ৯.৬৭ শতাংশ, অন্যদিকে পাকিস্তানে মূল্যস্ফীতি তখন ২৩ শতাংশের বেশি। মার্চ ২০২৪ সময়ে পাকিস্তানে ১ ডলার দাম ২৭৯ রুপি, বাংলাদেশে ১১০ টাকা। ১৫ মার্চ ২০২৪ এ পাকিস্তানে বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ ছিল ১৩৩৯ এবং বাংলাদেশে ১৯৯৮ (IMF এর হিসাব পদ্ধতি অনুযায়ী) কোটি মার্কিন ডলার। এ সময় পর্যন্ত পাকিস্তান IMF থেকে প্রায় ২৩০০ কোটি মার্কিন ডলারের মতো ঋণ নিয়েছে আর বাংলাদেশ গত ৫৩ বছরে IMF এর সঙ্গে ৭৫০ কোটি মার্কিন ডলারের ঋণচুক্তি করেছে। এছাড়া, ২০২৪ এর হিসাব অনুযায়ী, বাংলাদেশের মানুষের
গড় আয়ুষ্কাল ৭২.৪ বছর, ভারতে ৭২ বছর আর পাকিস্তানে ৬৯ বছর। বাংলাদেশ ও ভারতে এখন সাক্ষরতার হার ৭৭ শতাংশ
অন্যদিকে পাকিস্তানে এ হার ৫৯ শতাংশ। এ ছাড়া মাতৃমৃত্যু, শিশুমৃত্যু, প্রজনন হার এসব খাতেও বাংলাদেশ ভালো করছে।

বিশ্বব্যাংকের 'দ্য হিউম্যান ক্যাপিটাল ইনডেক্স ২০২২ আপডেট': মানবপুঁজি সূচকে বাংলাদেশের অবস্থান ১২৯তম, সেখানে শ্রীলংকার অবস্থান ৭৩তম, ভারত ও পাকিস্তানের অবস্থান যথাক্রমে ১৩২ ও ১৬১তম। মানব উন্নয়ন সূচকে সুইজারল্যান্ড, নরওয়ে ও আইসল্যান্ড শীর্ষস্থানে রয়েছে।

বাংলাদেশের অর্থনীতির ঐতিহাসিক পটভূমি

বাংলাদেশ ও পাকিস্তানের তুলনামূলক চিত্র

কাগজে-কলমে এখন পাকিস্তানে বেকার বেশি। কোভিড-১৯-এর অতিমারীর পূর্বে, বাংলাদেশে যেখানে বেকারের সংখ্যা ২৭ লাখ, সেখানে পাকিস্তানে প্রায় তা ৩৮ লাখ। বেকারত্বের হার বাংলাদেশে ৪.২ শতাংশ আর পাকিস্তানে ৪.৪৫ শতাংশ। শ্রমশক্তিতে তুলনামূলকভাবে বাংলাদেশে নারীদের অংশগ্রহণ বেশি। বাংলাদেশে ১ কোটি ৮৫ লাখ নারী মজুরির বিনিময়ে কাজ করে, পাকিস্তানে এ সংখ্যা ১ কোটি ৩৫ লাখ।

ওয়ার্ল্ড ইকোনমিক ফোরাম (WEF) এর প্রকাশিত 'বৈশ্বিক নারী-পুরুষ বৈষম্য প্রতিবেদন ২০২৩' এ উল্লেখ করা হয়েছে—বাংলাদেশ নারী-পুরুষের বৈষম্য সূচকে বড় অগ্রগতি বাংলাদেশের। বিশ্বের ১৪৬টি দেশের মধ্যে বাংলাদেশের অবস্থান ৬৫তম। ২০২২ সালে ছিল ৭১তম। দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোর মধ্যে টানা ৯ম বারের মতো শীর্ষস্থান ধরে রেখেছে বাংলাদেশ। এ সূচকে সবচেয়ে শীর্ষে 'আইসল্যান্ড' এবং সবচেয়ে বেশি বৈষম্যের দেশ 'আফগানিস্তান', ১৪২ নম্বরে পাকিস্তান, ভারত ১২৭, ভুটান ১০৩, মালদ্বীপ ১২৪, শ্রীলঙ্কা ১১৫, মিয়ানমার ১২৩ এবং নেপাল ১১৬তম স্থানে রয়েছে।

এক বছর বয়স হওয়ার পূর্বে প্রতি এক হাজার শিশুর মধ্যে বাংলাদেশে মারা যায় ২৭ জন, পাকিস্তানে মারা যায় ৬১ জন শিশু। জন্মের পাঁচ বছরের মধ্যে নানা রোগে-শোকে প্রতি হাজারে এদেশে মারা যায় ৩৩ জন, পাকিস্তানে তা ৭৪ জন। গর্ভধারণ ও সন্তান জন্মদানের কারণে বাংলাদেশে প্রতি এক লাখে ১৩৬ জন মা মারা যায়, পাকিস্তানে মারা যায় ১৭৮ জন মা।

—ইন্টারনেট; বা. অর্থ. সমীক্ষা-২০২৪ এবং অর্থ মন্ত্রণালয় ও পাকিস্তান পরিসংখ্যান ব্যুরো, ১৬.১২.২০১৯, প্রআ, পৃ. ১৪

THANK YOU

HSC
একাডেমিক কোর্স

অর্থনীতি ২য় পত্র

অধ্যায় ০১ : বাংলাদেশের অর্থনীতি পরিচয়

টপিক – ০২ বাংলাদেশের ভৌগলিক অবস্থান

টপিক ০২: বাংলাদেশের ভৌগলিক অবস্থান

This Topic is important for

MCQ	সৃজনশীল
	ক খ
	গ ঘ

বাংলাদেশের ভৌগলিক অবস্থান

১. ভৌগোলিক পরিচয় (Geographical Identity): বাংলাদেশ ২০° ৩৪ ‘ উত্তর থেকে ২৬° ৩৮ ‘ উত্তর অক্ষাংশ এবং ৮৮° ০১‘ পূর্ব থেকে ৯২° ৪১‘ পূর্ব দ্রাঘিমার মধ্যে অবস্থিত দক্ষিণ এশিয়ার একটি ক্ষুদ্র দেশ। মোট আয়তন হলো ৫৬,৯৯০ বর্গমাইল বা ১,৪৭,৬০৬.১৮ বর্গকিলোমিটার, ছিটমহল বিনিময়ের পর বাংলাদেশের আয়তন ৩৬.১৮ বর্গকিলোমিটার বৃদ্ধি পেয়েছে। নদী ও বনাঞ্চল বাদে বাংলাদেশের মোট আয়তন ১,১৫,৬০৬.৪৯ বর্গকিলোমিটার। কর্কটক্রান্তি রেখা বাংলাদেশের প্রায় মাঝখান দিয়ে অতিক্রম করায় দেশটি ক্রান্তীয় অঞ্চলে অবস্থিত। বাংলাদেশের তিন দিকে রয়েছে ভারত, দক্ষিণ-পূর্ব দিকে মিয়ানমার (বার্মা), দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর। বাংলাদেশের পশ্চিমে ভারতের পশ্চিমবঙ্গ ও বিহার, উত্তরে-পশ্চিমবঙ্গের উত্তরাঞ্চলের জেলা কোচবিহার, মেঘালয় ও আসাম এবং পূর্বদিকে মিজোরাম, ত্রিপুরা ও আসাম। তাই বলা যায়, ভারতের বৃহত্তর সীমানা বেষ্টিত হলো বাংলাদেশ।

২. সীমানা রেখা (Boundary Line): বাংলাদেশের মোট সীমানা হলো ৫,১৩৮ কিলোমিটার। এর মধ্যে স্থলসীমা ৪,৪২৭ কিলোমিটার এবং সমুদ্রসীমা ৭১১ কিলোমিটার। ভারতের সাথে মোট স্থল সীমানা দৈর্ঘ্য ৪,১৫৬ কিলোমিটার। মিয়ানমারের সাথে সীমানা দৈর্ঘ্য হলো ২৭১ কিলোমিটার। বাংলাদেশের রাজনৈতিক সমুদ্রসীমা হলো ১২ নটিক্যাল মাইল ও অর্থনৈতিক সমুদ্রসীমা ২০০ নটিক্যাল মাইল। *১ এ ছাড়াও চট্টগ্রাম উপকূল থেকে ৩৫৪ নটিক্যাল মাইল পর্যন্ত মহীসোপানের তলদেশের সব প্রাণিজ ও অপ্রাণিজ সম্পদের সার্বভৌমত্বের অধিকার বাংলাদেশের। সমুদ্রসীমার বিরোধ নিষ্পত্তির ফলে বঙ্গোপসাগরে ১,১৮,৮১৩ বর্গকিলোমিটার অঞ্চলে বাংলাদেশের নিরঙ্কুশ সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

বাংলাদেশের ভৌগলিক অবস্থান

৩. জনসংখ্যা (Population) : ২০০১ সালের শুমারি অনুযায়ী জনসংখ্যা ১৩ কোটি যা ২০১১ সালে ১৫.১৭ কোটিতে উন্নীত হয়। ২০২৩ সালের শুমারি অনুযায়ী জনসংখ্যা ১৭.১ কোটি। জনসংখ্যার ঘনত্ব প্রতি বর্গকিলোমিটারে ১১৭১ জন।[২] স্থূল জন্মহার (প্রতি ১০০০ জনে) ১৯.৪ এবং স্থূল মৃত্যুহার ৬.১ (প্রতি হাজারে); শিশু মৃত্যুহার (প্রতি হাজার জীবিত জন্মে-এক বছরের কম) ২৭ জন।[৩] জনসংখ্যার দিক থেকে বাংলাদেশ পৃথিবীর অষ্টম। চীন, ভারত, যুক্তরাষ্ট্র, ইন্দোনেশিয়া, পাকিস্তান, ব্রাজিল এবং নাইজেরিয়ার পরই বাংলাদেশের অবস্থান। বর্তমানে বাংলাদেশের মোট জনসংখ্যার প্রায় ৬৬ শতাংশ মানুষের বয়স ১৫–৫৯-এর মধ্যে।

৪. প্রতিবেশী দেশ (Neighbouring Country) : বাংলাদেশের প্রতিবেশী দেশ হলো ভারত, মিয়ানমার (বার্মা), নেপাল, ভুটান এবং শ্রীলংকা।

৫. ধর্ম (Religions) : বাংলাদেশের অধিবাসীদের অধিকাংশই মুসলমান। মোট জনসংখ্যার প্রায় ৯১.০৪% মুসলমান, ৭.৯৫% হিন্দু, ০.৬% বৌদ্ধ, ০.৩% খ্রিষ্টান ও অন্যান্য ০.১% ধর্মাবলম্বী।[৪]

উত্তর খুঁজে নাও :

- ভারতের সাথে ছিটমহল বিনিময়ের পর বাংলাদেশের আয়তন বেড়েছে কত বর্গকিলোমিটার?
  (ক) ৩৬.১৮ (খ) ৯০
  (গ) ৬০৬.১৮ (ঘ) ৭১১

৬. ভাষা (Language) : বাংলাদেশের রাষ্ট্রভাষা একমাত্র বাংলা। তবে সীমিতভাবে স্কুল-কলেজ এবং উচ্চশিক্ষায় ইংরেজি ভাষা ব্যবহারের প্রচলনও রয়েছে। এছাড়া আংশিকভাবে অফিস-আদালতেও ইংরেজির প্রচলন লক্ষ্য করা যায়।

THANK YOU

HSC
একাডেমিক কোর্স

অর্থনীতি ২য় পত্র

অধ্যায় ০১ : বাংলাদেশের অর্থনীতি পরিচয়

টপিক – ০৩ চাহিদা

চাহিদা

This Topic is important for

MCQ	সৃজনশীল
	ক খ
	গ ঘ

চাহিদা

উপরিউক্ত তিনটি বৈশিষ্ট্যের সমন্বয়কে কার্যকর চাহিদা বলে। অর্থনীতিতে চাহিদা শব্দটি কার্যকর চাহিদা অর্থেই ব্যবহৃত হয়। বিভিন্ন অর্থনীতিবিদ 'চাহিদা'কে বিভিন্নভাবে সংজ্ঞায়িত করেন। যেমন-

অধ্যাপক পেনসন (Penson)-এর মতে, "কোনো দ্রব্য পাওয়ার আকাঙ্ক্ষার পেছনে অর্থ ব্যয় করার সামর্থ্য ও ইচ্ছা থাকলে তাকে চাহিদা বলে।

অর্থনীতিবিদ ববার (Bober)-এর মতে, “কোনো নির্দিষ্ট সময়ে কোনো বাজারে ক্রেতারা বিভিন্ন দামে বা বিভিন্ন আয়ে অথবা সম্পর্কযুক্ত দ্রব্যের বিভিন্ন দামে, কোনো নির্দিষ্ট দ্রব্য বা সেবার যে বিভিন্ন পরিমাণ ক্রয় করে তাকে চাহিদা বলে।"2 অর্থনীতিবিদ বেনহাম (Benham) এর মতে, “কোনো নির্দিষ্ট সময়ে ক্রেতা বিভিন্ন দামে একটি দ্রব্যের যে বিভিন্ন পরিমাণ ক্রয় করতে প্রস্তুত থাকে, তাকে ঐ দ্রব্যের চাহিদা বলে।"3

অধ্যাপক র‍্যাগান এবং থমাস (Ragan & Thomas)-এর মতে, “চাহিদার পরিমাণ হলো সে পরিমাণ দ্রব্য যা ভোক্তা নির্দিষ্ট দামে ক্রয় করতে ইচ্ছুক।"4

উপরিউক্ত সংজ্ঞাসমূহের আলোকে, অর্থনীতিতে চাহিদাকে সুনির্দিষ্টকরণের প্রয়োজনে চাহিদার প্রচলিত সংজ্ঞা দাঁড়ায়-একটি নির্দিষ্ট সময়ে এবং নির্দিষ্ট দামে ক্রেতা বা ক্রেতাগণ প্রকৃতিতে বা বাজারে সরবরাহকৃত একটি দ্রব্য বা সেবার যে পরিমাণ ক্রয় করতে প্রস্তুত, তাকে চাহিদা বলে।

ওপরের সংজ্ঞাসমূহ বিশ্লেষণ করে চাহিদার কয়েকটি বৈশিষ্ট্য পাওয়া যায়। যেমন: (১) একটি নির্দিষ্ট সময়ের ভিত্তিতে চাহিদা পরিমাপ করা হয়। (২) চাহিদা একটি নির্দিষ্ট দ্রব্যের জন্য বিবেচ্য। (৩) একটি নির্দিষ্ট স্থান বা ব্যক্তির চাহিদা পরিবর্তিত অবস্থায় বা বাজার ধারণায় পরিবর্তিত হতে পারে।

THANK YOU

HSC
একাডেমিক কোর্স

অর্থনীতি ২য় পত্র

অধ্যায় ০১ : বাংলাদেশের অর্থনীতি পরিচয়

টপিক – ০৪ পরিবেশ

পরিবেশ

This Topic is important for

MCQ	সৃজনশীল
	ক খ
	গ ঘ

পরিবেশ

সাধারণ অর্থে পরিবেশ বলতে পারিপার্শ্বিক অবস্থাকে বোঝায় যা মানুষ, প্রাণী ও উদ্ভিদের বিকাশকে প্রভাবিত করে। তবে আরও সুনির্দিষ্টভাবে যে পারিপার্শ্বিক অবস্থা উন্নয়নের ধারাকে প্রভাবিত করে তাই পরিবেশ। পরিবেশ শব্দটির অর্থ বিস্তৃত ও ব্যাপক। পরিবেশ প্রাকৃতিক ও সাংস্কৃতিক বা সামাজিক উপাদানের সমন্বয়ে গঠিত।

পরিবেশের উপাদানসমূহ (Elements of Environment)

পরিবেশকে প্রধানত দু'ভাগে ভাগ করা হয়। যথা:

১. প্রাকৃতিক পরিবেশ ও

২. সাংস্কৃতিক, মানবিক বা সামাজিক পরিবেশ।

১. প্রাকৃতিক পরিবেশ (Physical Environment)

আমাদের চারপার্শ্বে প্রকৃতি প্রদত্ত যেসব বস্তু আছে তাদেরকে সমষ্টিগতভাবে প্রাকৃতিক পরিবেশ হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো শ্বাস-প্রশ্বাসের জন্য প্রয়োজনীয় বাতাস, অবস্থানের জন্য মাটি, পানি, আলো, তাপমাত্রা, আর্দ্রতা, বায়ুপ্রবাহ, স্রোত, জীবিত এবং ভৌত উপাদান (অক্সিজেন, কার্বন-ডাই-অক্সাইড, ক্যালসিয়াম, পটাশিয়াম, সোডিয়াম, ম্যাগনেশিয়াম, বিভিন্ন ধরনের কার্বনেট ও ফসফেটের যৌগসমূহ প্রভৃতি) যা আমাদের জীবনযাত্রাকে প্রভাবিত করে।

পরিবেশ

প্রাকৃতিক পরিবেশ হতে প্রাকৃতিক ভারসাম্য বিষয়ে আমরা অবহিত হই

ক. পরিবেশ দূষণ, জনস্ফীতি, ভূমিক্ষয় ইত্যাদি ক্রমবর্ধিষ্ণু সমস্যা এবং সেসবের যথাযথ সমাধানে সচেষ্ট হতে পারি।

খ. অরণ্য ভূমি ও অন্যান্য প্রাকৃতিক সম্পদ সংরক্ষণের প্রয়োজনীয়তা বিষয়ে সচেতনতা অনুভব করি।

গ. বন্যপ্রাণী ব্যবস্থাপনায় সুষ্ঠু ধারণা পাই।

ঘ. কৃষি, মৎস্য চাষ প্রভৃতির উৎপাদন বৃদ্ধিতে সচেষ্ট হওয়া যায়।

৬. ফসল অথবা স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকর জীবগুলো দমন, জীবের স্বাভাবিক জীবনযাত্রা, বিবর্তন প্রভৃতি প্রাকৃতিক পরিবেশ-এর ওপর নির্ভর করে।

বাংলাদেশের প্রাকৃতিক পরিবেশ

বৈচিত্র্যময় ভৌগোলিক অবস্থানের কারণে বাংলাদেশ বিশ্বের অন্যতম জীববৈচিত্র্যসমৃদ্ধ একটি দেশ। তবে অন্যান্য উন্নয়নশীল দেশের মতোই বাংলাদেশেও পরিবেশগত উন্নয়ন একটি বড় চ্যালেঞ্জ। যেহেতু অর্থনৈতিক কার্যাবলি এখনও দেশের প্রাকৃতিক সম্পদের ওপর বহুলাংশে নির্ভরশীল, সেহেতু গুরুত্বপূর্ণ সেক্টরসমূহের জিডিপি-তে অবদান টেকসই ও উন্নত পরিবেশ (quality of environment) দ্বারা অনেকাংশে প্রভাবিত হয়। অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও টেকসই পরিবেশ পরস্পর অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত হওয়ায় পরিবেশ সংশ্লিষ্ট বিষয়াদিকে উন্নয়ন কার্যক্রমের সাথে সমন্বিত করার বিষয়টি গুরুত্ব পাচ্ছে। চাচী বাংলাদেশের প্রাকৃতিক পরিবেশের মধ্যে মিশে আছে দরিদ্রতা, জনস্ফীতি এবং জনসচেতনতার অভাব। একই সাথে বিদ্যমান প্রাকৃতিক দুর্যোগ-বন্যা, খরা, মঙ্গা, ঘূর্ণিঝড়, জলোচ্ছ্বাস প্রভৃতি।

বাংলাদেশের প্রাকৃতিক পরিবেশ

বাংলাদেশের প্রাকৃতিক পরিবেশের স্বতন্ত্র উপাদানসমূহ নিম্নে আলোচনা করা হলো:

(ক) ভৌগোলিক অবস্থান: বাংলাদেশ ২০০৩৪ থেকে ২৬°৩৮ উত্তর অক্ষাংশ এবং ৮৮০০১ থেকে ৯২০৪১ পূর্ব দ্রাঘিমার মধ্যে অবস্থিত। বাংলাদেশের দক্ষিণ-পূর্ব দিকে কিছুটা সীমান্ত মিয়ানমারের সাথে সংযুক্ত। এছাড়া তিনদিকে ভারত এবং দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর। ভারতের সাথে সীমানা দৈর্ঘ্য ৪,১৫৬ কিলোমিটার, মিয়ানমারের সাথে ২৭১ কিলোমিটার এবং বঙ্গোপসাগরের সাথে সমুদ্র উপকূলের দৈর্ঘ্য ৭১১ কিলোমিটার।

বাংলাদেশের প্রাকৃতিক পরিবেশ

(খ) ভূ-প্রকৃতি: বাংলাদেশের ভূপৃষ্ঠের ভূমিরূপ সর্বত্র একরূপ নয়। ভূ-প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্য বিবেচনায় বাংলাদেশের ভূ-প্রকৃতি প্রধানত দু'ধরনের (যথা-সমভূমি এবং পাহাড়ি) হলেও এর মধ্যে ভিন্নতা বা বিভিন্নতা রয়েছে। কোনো স্থানের ভূ-প্রকৃতি পার্বত্য, সমভূমি, বনভূমি, বরেন্দ্রভূমি এবং কোথাও মাটির রং লাল বা জলাশয়, হাওর-বিল প্রভৃতি বিদ্যমান। চট্টগ্রাম, পার্বত্য চট্টগ্রাম ও সিলেটের টারশিয়ারি যুগের পাহাড়ি অঞ্চল; রাজশাহী অঞ্চলের বরেন্দ্রভূমি, মধুপুর ও ভাওয়ালের গড় এবং কুমিল্লার লালমাই পাহাড় হলো প্লাইস্টোসিন এবং হলোসিন কালের চত্বর ভূমি বা সোপান যা প্রায় ২৫,০০০ বছর পূর্বে গঠিত। এছাড়াও রয়েছে খুলনা, রংপুর ও দিনাজপুর এলাকার বনভূমি। মৌলভীবাজার ও হবিগঞ্জের পার্বত্য অঞ্চলে প্রচুর বৃষ্টিপাত হয় এবং চাও উৎপাদন হয়। এছাড়া এখানে রয়েছে প্রাকৃতিক গ্যাস, খনিজ তেল, কয়লা ও চুনাপাথর। বরেন্দ্রভূমি, গড় ও লালমাই এলাকায় উৎপাদন হয় আলু, আনারস, তরমুজ, ভুট্টা ও পান এবং বিস্তীর্ণ উর্বর সমভূমিতে ধান, পাট, ইক্ষু, তামাকসহ বিভিন্ন সবজি ও ফলমূল।

বাংলাদেশের প্রাকৃতিক পরিবেশ

(গ) উপকূল রেখা: বাংলাদেশের দক্ষিণে বঙ্গোপসাগরের সাথে ৭১১ কিলোমিটার দীর্ঘ সমুদ্র উপকূল রেখা রয়েছে। খুলনার রায়মঙ্গল নদীর মোহনা হতে কক্সবাজারের টেকনাফ পর্যন্ত এটি বিস্তৃত। সমুদ্রের উপকূলভাগ ভগ্ন বা অভগ্ন উভয়ই হতে পারে। ভগ্ন উপকূলবিশিষ্ট দেশে সহজেই বন্দর ও পোতাশ্রয় গড়ে ওঠে। বাংলাদেশের উপকূল রেখা বেশি ভগ্ন ও গভীর নয়। এ কারণে চট্টগ্রাম, মোংলা ও পায়রা নামক তিনটি সামুদ্রিক বন্দর গড়ে ওঠেছে। চট্টগ্রামে কর্ণফুলী নদীর তীরে ২৫ এপ্রিল ১৮৮৭ সালে চট্টগ্রাম সমুদ্র বন্দর উদ্বোধন হয় এবং ১৮৮৮ সাল হতে এর কার্যক্রম শুরু হয়। পশুর নদী ও মোংলা নালার সংযোগ স্থলে ১৯৫০ সালের ১ ডিসেম্বর মোংলা সামুদ্রিক বন্দরের গোড়াপত্তন হয়।

স্বাধীন বাংলাদেশের প্রথম ও দেশের তৃতীয় সামুদ্রিক বন্দর হলো পায়রা। পটুয়াখালীর কলাপাড়া উপজেলার লালুয়া ও বালিয়াতলী সংলগ্ন রামনাবাদ চ্যানেল ও সংলগ্ন আন্দারমানিক নদীর তীরে টিয়াখালী ইউনিয়নে ইটবাড়িয়া স্থানে ১৯ নভেম্বর ২০১৩ খ্রি. পায়রা বন্দরের ভিত্তিফলক উন্মোচন হয় এবং আগস্ট ১৩, ২০১৬ সালে সমুদ্র বন্দরটির আনুষ্ঠানিক যাত্রা শুরু হয়।

এছাড়া এ অঞ্চলে সন্দ্বীপ, হাতিয়া, মহেশখালী, সেন্টমার্টিন, কুতুবদিয়া প্রভৃতি ছোট বড় অসংখ্য দ্বীপ রয়েছে।

বাংলাদেশের প্রাকৃতিক পরিবেশ

(ঘ) নদ-নদী: মানুষের অর্থনৈতিক জীবনে নদীর প্রভাব খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। পানীয় জলের অভাব পূরণ, কৃষিক্ষেত্রে পানি সেচ, জলপথে সুলভ ব্যবসায়-বাণিজ্যের সুবিধা, মৎস্য আহরণ, পানি বিদ্যুৎ উৎপাদন ইত্যাদির মাধ্যমে নদী মানুষের জীবনকে নানাভাবে প্রভাবিত করে। পদ্মা, মেঘনা, যমুনা হলো বাংলাদেশের প্রধান নদী। বাংলাদেশের মোট নদী ২৩৩টি। আন্তঃসীমান্ত নদী ৫৭টি (ভারত ৫৪ + মিয়ানমার ৩)। মিয়ানমার থেকে আসা নদীগুলো হলো নাফ, মাতামুহুরী ও সাঙ্গু। প্রায় ১০০৮টি নদী-উপনদী, শাখা নদীর সমন্বয়ে বিশ্বের অন্যতম বৃহৎ নদীব্যবস্থা গড়ে ওঠেছে।'। এ কারণে পলি বিধৌত উর্বর ভূমির দেশ বাংলাদেশ।

(ঙ) জলবায়ু ও বৃষ্টিপাত: জলবায়ুর তারতম্যের ফলে বিভিন্ন স্থানের মানুষের বাসস্থান, পেশা, অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপ ইত্যাদির মধ্যে পার্থক্য হয়ে থাকে। মানুষের দৈহিক গঠন ও কাঠামো, কর্মদক্ষতা ইত্যাদিও জলবায়ুর ওপর নির্ভর করে। বাংলাদেশের জলবায়ু উষ্ণ, আর্দ্র ও সমভাবাপন্ন। গ্রীষ্মকালে মৌসুমি বায়ুর প্রভাবে প্রচুর বৃষ্টিপাত হয়। এখানে বৃষ্টিপাত ১২০-৩৪৫.৪ সে.মি, হলেও গড়ে ২০৩ সে.মি, বাতাসের গড় আর্দ্রতা সর্বোচ্চ ৯৯% এবং সর্বনিম্ন ৩৬%।

বাংলাদেশের প্রাকৃতিক পরিবেশ

(চ) তাপমাত্রা: বাংলাদেশ ক্রান্তীয় মৌসুমি জলবায়ুর দেশ। গ্রীষ্মকালে এখানে গড় তাপমাত্রা ২১০-৩৪° সেলসিয়াস এবং শীতকালে ১১০-২৯° সেলসিয়াস থাকে। গ্রীষ্মকালে সর্বোচ্চ গড় তাপমাত্রা ৩৭° সেলসিয়াস এবং শীতকালে সর্বনিম্ন গড় তাপমাত্রা ৭০ সেলসিয়াস লক্ষ্য করা গিয়েছে।

(ছ) মৃত্তিকা: মৃত্তিকার গুণাগুণের ওপর কৃষির সাফল্য নির্ভর করে। নদীমাতৃক বাংলাদেশের ভূমির বেশিরভাগ নদী বিধৌত পলি দ্বারা গঠিত। এখানকার মাটিতে প্রাকৃতিকভাবেই নাইট্রিক ও ফসফরিক এসিড থাকায় জমির উর্বরতা বৃদ্ধি পেয়েছে। ফলে উর্বর মৃত্তিকাযুক্ত এ অঞ্চলে কৃষির উন্নতি এবং কৃষিনির্ভরশীল শিল্প বিকশিত হচ্ছে।

(জ) উদ্ভিদ: জলবায়ু, মৃত্তিকার পার্থক্যের কারণে বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন ধরনের উদ্ভিদ জন্মে। এভাবে বনভূমির সৃষ্টি হয়। উদ্ভিদ ও বনাঞ্চল দ্বারা বৃষ্টিপাত, বায়ুর আর্দ্রতা, ভূমি ক্ষয়রোধ, বন্যা নিয়ন্ত্রণ প্রভৃতি গুরুত্বপূর্ণ কার্যাবলি প্রভাবিত হয়। বাংলাদেশের উল্লেখযোগ্য বনাঞ্চল হলো ২:

বাংলাদেশের প্রাকৃতিক পরিবেশ

(i) চট্টগ্রাম, পার্বত্য চট্টগ্রাম ও সিলেটের পাহাড়ি বনভূমি যা ক্রান্তীয় চিরহরিৎ অরণ্য (tropical evergreen / semi evergreen forest) নামে পরিচিত, মোট আয়তন ১৫,৩২৬ বর্গকিলোমিটার।
(ii) ঢাকা, টাঙ্গাইল, ময়মনসিংহ, দিনাজপুর ও রংপুরে ক্রান্তীয় পতনশীল ও পত্রযুক্ত বৃক্ষের (tropical moist deciduous forest) বনভূমি, মোট আয়তন ৮৭৫ বর্গকিলোমিটার। এবং
(iii) সুন্দরবন, Tidal বা Mangrove বনভূমি, আয়তন ৬,৭৮৬ বর্গকিলোমিটার (২০১৭ বা. অর্থনৈতিক সমীক্ষা অনুযায়ী ৬০১৭ বর্গকিলোমিটার)।
যেকোনো দেশের শতকরা ২৫% বনভূমি থাকা আবশ্যক হলেও ২০২৩-২৪ এর তথ্যানুসারে সরকার নিয়ন্ত্রিত বাংলাদেশে বর্তমানে দেশের মোট আয়তনের মাত্র ১৫.৫৮ শতাংশ বনভূমি রয়েছে এবং বন অধিদপ্তরের নিয়ন্ত্রিত বনভূমি দেশের মোট আয়তনের প্রায় ১০.৭৪ শতাংশ।"
এর মধ্যে প্রাকৃতিক ম্যানগ্রোভ বন ৩৮.৭১%, পাহাড়ি বন ৩০.০০%, সৃজিত ম্যানগ্রোভ বন ১১.৪২%, শাল বন ৭.৬১% এবং জলাভূমির বন ১.৭১%। বন অধিদপ্তরের নিয়ন্ত্রিত বনভূমির পরিমাণ দেশের মোট আয়তনের প্রায় ১২.৭৪ শতাংশ। বর্তমানে বনসহ বৃক্ষাচ্ছাদিত ভূমির পরিমাণ
বৃদ্ধি পেয়ে দেশের মোট আয়তনের প্রায় ২২.৩৭ শতাংশে উন্নীত হয়েছে।

সাংস্কৃতিক, মানবিক বা সামাজিক পরিবেশ

মানুষের সামাজিক কার্যাবলির সমষ্টিগত ফলাফল যা মানুষের দ্বারা সৃষ্ট ও নিয়ন্ত্রিত, তাই হলো সামাজিক পরিবেশ। এ পরিবেশের উপাদানগুলো হলো জাতি, ধর্ম, সরকার, জনসংখ্যা, শিক্ষা ও প্রযুক্তি প্রভৃতি।

জাতি: বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন জাতির লোক বাস করে। পরিবেশের ওপর এদের মানসিকতা, চরিত্র, শারীরিক শক্তি প্রভাব বিস্তার করে।

ধর্ম: ধর্ম সামাজিক পরিবেশের ওপর প্রভাব বিস্তার করে। বিভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের রীতি-নীতি, আচার-অনুষ্ঠান অর্থনীতিতে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখে। যেমন সুদমুক্ত ব্যাংকব্যবস্থা।

জনসংখ্যা***: ১৯০১ সালে বাংলাদেশ এলাকায় জনসংখ্যা ছিল ২.৮৯ কোটি*1, ১৯৫১ সালে ৪.৪১ কোটি, ২০০১ সালে ১৩.০ কোটি। জনশুমারি ও গৃহগণনা, ২০২২ এর চূড়ান্ত প্রতিবেদন অনুযায়ী দেশে মোট জনসংখ্যা ১৬ কোটি ৯৮ লক্ষ ২৮ হাজার ৯১১ জন। এর মধ্যে ২৮ শতাংশই তরুণ এবং ৬২ শতাংশ মানুষই কর্মক্ষম। কোনো দেশের ব্যবসা-বাণিজ্যের উন্নতি, কৃষি, শিল্প, খনিজ প্রভৃতি ক্ষেত্রের উন্নতি সাধনে জনবসতি বিশেষ সহায়তা করে। যেমন: বিরল জনবসতির জন্য অস্ট্রেলিয়া পশুচারণভূমি কিন্তু ঘন জনবসতির ফলে যুক্তরাজ্য ব্যবসা-বাণিজ্য ও শিল্পে যথেষ্ট উন্নত।

এছাড়া সরকারের শিল্পনীতি, বাণিজ্যনীতি, দক্ষ মানবসম্পদ, কারিগরি শিক্ষা ও প্রযুক্তিবিদ্যা এসব উপাদান সামাজিক পরিবেশকে প্রভাবিত করে অর্থনৈতিক উন্নয়ন ত্বরান্বিত করে।

সাংস্কৃতিক, মানবিক বা সামাজিক পরিবেশ

জীববৈচিত্র্যসমৃদ্ধ বাংলাদেশে অন্যান্য উন্নয়নশীল দেশের মতোই পরিবেশগত উন্নয়ন একটি বড় চ্যালেঞ্জ। অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও টেকসই পরিবেশ রক্ষার লক্ষ্যে পরিবেশ সংশ্লিষ্ট বিষয়াদিকে উন্নয়ন কার্যক্রমের সাথে সমন্বিত করার প্রয়াস অব্যাহত রয়েছে। পরিবেশগত সমস্যাসমূহ মোকাবেলা করে দূষণমুক্ত সুস্থ পরিবেশ ও পরিবেশবান্ধব প্রতিবেশ গড়ে তুলতে বিভিন্ন নীতি এবং উন্নয়ন পরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। ইতোমধ্যে টেকসই পরিবেশ নিশ্চিতকরণ সংক্রান্ত জাতিসংঘ ঘোষিত সহস্রাব্দ উন্নয়ন (MDG,) (লক্ষ্য-৭) এর আওতায় নিরাপদ সুপেয় পানি ও স্বাস্থ্যসম্মত ল্যাট্রিন প্রাপ্যতা নিশ্চিতকরণে বাংলাদেশ উল্লেখযোগ্য সাফল্য অর্জিত হয়েছে। জলবায়ু পরিবর্তনজনিত ঝুঁকি মোকাবেলা ও অভিযোজন কর্মসূচি ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ অব্যাহত রয়েছে। জাতিসংঘ ঘোষিত বর্তমানে প্রচলিত SDG' বা টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রার-৬, ১৩, ১৪ এবং ১৫ নং অভীষ্ট লক্ষ্যসমূহের অর্জন সম্ভব হলে সামাজিক পরিবেশের উন্নয়নে অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ অগ্রগতি অর্জিত হবে আশা করি। যেমন- (ক) ৬ নং অভীষ্ট লক্ষ্য হলো Clean Water and Sanitation, (খ) ১৩ নং অভীষ্ট লক্ষ্য হলো Climate Action, (গ) ১৪ নং অভীষ্ট লক্ষ্য হলো Life below Water এবং (ঘ) ১৫ নং অভীষ্ট লক্ষ্য হলো Life and land ।

পরিবেশ

সাংস্কৃতিক, মানবিক বা সামাজিক পরিবেশ

প্রাকৃতিক পরিবেশ ও সামাজিক পরিবেশের মধ্যে পার্থক্য (Difference between Physical Environment and Social Environment) উৎপত্তি বা জন্মগতভাবেই প্রাণিকুল পরিবেশের নিকট দায়বদ্ধ। প্রাণিকুলের অস্তিত্ব রক্ষা, বংশবিস্তার, উন্নয়ন সবই পরিবেশ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। পরিবেশ দু প্রকার। যথা-

(ক) প্রাকৃতিক পরিবেশ এবং

(খ) সামাজিক পরিবেশ।

প্রাকৃতিক এবং সামাজিক পরিবেশ এ উভয় ধারণার মধ্যে যেসব পার্থক্য বিদ্যমান তা নিম্নরূপ:

১. সংজ্ঞা: প্রকৃতি প্রদত্ত যেসব উপাদান বা শক্তির সমন্বয়ে প্রাণিকুলের উন্নয়নের ধারা প্রভাবিত হয় তাকে প্রাকৃতিক পরিবেশ বলে। পক্ষান্তরে মানবসৃষ্ট পরিবেশকে সামাজিক পরিবেশ বলে।

২. উপাদান: প্রাকৃতিক পরিবেশের উপাদান হলো ভূ-প্রকৃতি, মৃত্তিকা, উপকূলরেখা, নদ-নদী, জলবায়ু ও বৃষ্টিপাত, খনিজ সম্পদ, বায়ু প্রবাহ ইত্যাদি। অন্যদিকে সামাজিক পরিবেশের উপাদান হলো জাতি, ধর্ম, সরকার, জনসংখ্যা এবং শিক্ষা ও প্রযুক্তি ইত্যাদি।

সাংস্কৃতিক, মানবিক বা সামাজিক পরিবেশ

৩. পরিবর্তনশীলতা: প্রাকৃতিক পরিবেশ-এর উপাদানসমূহ স্থির বা অপরিবর্তনীয় কিন্তু সামাজিক পরিবেশ-এর উপাদানসমূহ পরিবর্তনশীল।

৪. নির্ভরশীলতা: প্রাকৃতিক পরিবেশ সামাজিক পরিবেশ-এর ওপর নির্ভরশীল নয় কিন্তু সামাজিক পরিবেশের উপাদানসমূহ প্রাকৃতিক পরিবেশ-এর উপাদান দ্বারা প্রভাবিত বা নির্ভরশীল।

৫. অর্থনৈতিক প্রভাব: প্রাকৃতিক পরিবেশের তারতম্য শুধুমাত্র মানুষের অর্থনৈতিক কার্যকলাপই নয়, মানুষের খাদ্য, পরিধেয়, বাসস্থান, কর্মদক্ষতা ও জীবনযাত্রার মান ইত্যাদিরও পরিবর্তন করে থাকে। প্রাকৃতিক পরিবেশের তারতম্যের কারণে পৃথিবীর কোনো অঞ্চলের মানুষ কর্মঠ, প্রগতিশীল এবং পরিশ্রমী। আবার অন্য অঞ্চলের মানুষ অলস প্রকৃতির।

তবে সামাজিক পরিবেশের ভূমিকা এরূপ নয়। শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ, গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থা, উন্নয়নমনস্ক প্রগতিশীল জাতি, জনসংখ্যা সভ্যতার বিবর্তনে ভূমিকা রাখে।

আলোচনা থেকে বলা যায়, প্রাকৃতিক পরিবেশকে উৎপত্তির ভিত্তি বললে সামাজিক পরিবেশকে সভ্যতার ক্রমবিবর্তন বলা যুক্তিযুক্ত।

বাংলাদেশের অর্থনীতিতে প্রাকৃতিক পরিবেশের প্রভাব

কোনো অঞ্চলের অধিবাসীদের জীবনযাপন প্রণালি একটি আকস্মিক ঘটনা নয়, এটি পরিবেশের সমন্বিত ফল। পরিবেশের প্রভাবে যুক্তরাষ্ট্র, জার্মানি, জাপান প্রভৃতি দেশ যন্ত্রশিল্পে উন্নত, বাংলাদেশ ভারতের প্রধান উপজীবিকা কৃষি এবং অস্ট্রেলিয়া ও আর্জেন্টিনার পশুপালনই প্রধান উপজীবিকা। অর্থাৎ পরিবেশের তারতম্য অনুসারে শুধু মানুষের অর্থনৈতিক কার্যকলাপই নয়, মানুষের খাদ্য, পরিধেয়, বাসস্থান, জীবনযাত্রার মান, কর্মদক্ষতা ইত্যাদিও পরিবর্তন হয়ে থাকে। পরিবেশের পার্থক্যের কারণে কোনো অঞ্চলের মানুষ কর্মঠ, প্রগতিশীল আবার কোনো অঞ্চলের মানুষ অলস প্রকৃতির ও অনুন্নত।
বাংলাদেশের ভৌগোলিক অবস্থান, প্রাকৃতিক সম্পদ ও জলবায়ু দেশটির অর্থনীতির ওপর কীরূপ প্রভাব ফেলেছে তা নিম্নে আলোচনা করা হলো:

বাংলাদেশের অর্থনীতিতে প্রাকৃতিক পরিবেশের প্রভাব

১. ভৌগোলিক অবস্থান: যেকোনো দেশের ভৌগোলিক অবস্থান সে দেশের ব্যবসায়-বাণিজ্যকে বহুলাংশে নিয়ন্ত্রিত করে। যদি কোনো দেশের সাথে অন্যান্য দেশের পরিবহণব্যবস্থার কোনো সংযোগ না থাকে সেক্ষেত্রে ঐ দেশের ব্যবসা-বাণিজ্য প্রসার লাভ করতে পারে না। এক্ষেত্রে বাংলাদেশের রয়েছে প্রচুর সম্ভাবনা। মহাসাগরে প্রবেশের উন্মুক্ত প্রবেশদ্বার 'বঙ্গোপসাগর', দীর্ঘ সমুদ্র সৈকত-কক্সবাজার, সমুদ্রবন্দর, ভারত ও মিয়ানমারের সাথে সংযুক্ত স্থলপথ, স্থলবন্দর, আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর, দ্রুতগতির আন্তর্জাতিক সুপার অপটিক্যাল ফাইবার লাইনের সাথে সংযুক্ত যোগাযোগব্যবস্থার বৈপ্লবিক উন্নয়নে, স্বাধীন বাংলাদেশের নিজস্ব প্রথম স্যাটেলাইট 'বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট-১'১ উৎক্ষেপণ প্রভৃতি কারণে ভূ-রাজনৈতিক সুবিধার কেন্দ্রবিন্দুতে অবস্থান করছে বাংলাদেশ। চীন ও ভারতের মতো অর্থনৈতিক পরাশক্তির পার্শ্ববর্তী দেশ হওয়ায় বাংলাদেশ বিশ্ববাণিজ্যব্যবস্থায় এবং আঞ্চলিক বাণিজ্যে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালনে সক্ষম হবে।

বাংলাদেশের অর্থনীতিতে প্রাকৃতিক পরিবেশের প্রভাব

২. ভূ-প্রকৃতি: ব্যবসায়-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে ভূ-প্রকৃতির প্রভাবও অপরিসীম। বাংলাদেশের পার্বত্য অঞ্চলে রাস্তাঘাট ও রেলপথ নির্মাণ ব্যয়বহুল ও কষ্টকর, নদ-নদীগুলো খরস্রোতা বলে নাব্য নয়। সে কারণে পার্বত্য অঞ্চলে পরিবহণব্যবস্থা খুবই অনুন্নত ফলে ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রসার ঘটেনি। অন্যদিকে সমভূমিতে রাস্তাঘাট নির্মাণ করা সহজ বিধায় বাংলাদেশের ব্যবসা-বাণিজ্য সমভূমিকেন্দ্রিক। বাংলাদেশের নদ-নদীগুলো খরস্রোতা নয় বলে এ ধরনের নদ-নদী নৌ-চলাচলের পক্ষে যথেষ্ট উপযোগী। এক্ষেত্রে সড়কপথ, রেলপথ, নৌপথ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে।

৩. জলবায়ু: জলবায়ু দেশের ব্যবসা-বাণিজ্যের ওপর ব্যাপকভাবে প্রভাব বিস্তার করে থাকে। জলবায়ুর পার্থক্যের দরুন দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন প্রকার ফসল উৎপন্ন হয়। এ কারণে দেশের কোনো অঞ্চল বা কোনো দেশ সব প্রকার দ্রব্য উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণ নয়। তাই প্রত্যেক অঞ্চল বা দেশ নিজ নিজ ঘাটতি পূরণের জন্য বাণিজ্য বা বৈদেশিক বাণিজ্যে লিপ্ত হয়।

৪. নদ-নদী: ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে নদ-নদীর ভূমিকাও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। নদীপথে স্বল্প খরচে পণ্য-দ্রব্য আমদানি ও রপ্তানি করা যায়। বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ নৌ-পথে বেসরকারি খাতের প্রায় ৯৫ শতাংশ যাত্রী ও মালামাল পরিবাহিত হয়ে থাকে।"

বাংলাদেশের অর্থনীতিতে প্রাকৃতিক পরিবেশের প্রভাব

৫. উপকূল রেখা: দেশের ব্যবসা-বাণিজ্যের ওপর উপকূল রেখার প্রভাবও লক্ষ্যণীয়। এ রেখা ভগ্ন হলে এবং নিকটবর্তী সমুদ্র গভীর হলে সেখানে বন্দর নির্মাণ করা সহজসাধ্য হয়।

দেশের ভৌগোলিক সুবিধাকে কাজে লাগিয়ে আঞ্চলিক বাণিজ্য প্রসারের লক্ষ্যে কক্সবাজার জেলার মাতারবাড়ি এলাকায় গভীর সমুদ্র বন্দর স্থাপনের কাজ হাতে নেয়া হয়েছে। গভীর সমুদ্র বন্দর স্থাপিত হলে ভারত, চীন, জাপান ও মিয়ানমারসহ এ অঞ্চলের ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রসার ঘটবে।

এছাড়া চট্টগ্রাম ও মংলা বন্দরের পাশাপাশি দেশের দক্ষিণাঞ্চলে পটুয়াখালী জেলায় পায়রা তৃতীয় সমুদ্রবন্দর স্থাপনের কাজ সম্পন্ন হয়ে ২০১৬ সালের ১৩ আগস্ট চালু হয়েছে। বাংলাদেশের প্রধান সামুদ্রিক বন্দর চট্টগ্রাম-এর মাধ্যমে দেশের আমদানি-রপ্তানি বাণিজ্যের প্রায় ৯২ শতাংশ পরিচালিত হয়ে থাকে। (বা. অর্থ, সমীক্ষা- ২০২৪)

বাংলাদেশের অর্থনীতিতে প্রাকৃতিক পরিবেশের প্রভাব

৬. প্রাকৃতিক সম্পদ: ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে প্রাকৃতিক সম্পদের প্রভাবও অপরিসীম। বাংলাদেশের মৃত্তিকা, খনিজ, বনজ ও মৎস্য সম্পদ হলো প্রধান প্রাকৃতিক সম্পদ।
অর্থনীতিতে এদের প্রভাব নিম্নে আলোচনা করা হলো:
(i) মৃত্তিকা: মাটির গুণাবলির পার্থক্যের কারণে এক এক অঞ্চলে এক এক প্রকার ফসল উৎপাদিত হয়। বাংলাদেশের মাটিতে উন্নতমানের পাট প্রচুর পরিমাণে জন্মে বলে বৈদেশিক বাণিজ্যে পাট গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। এছাড়া বাঁশ, বেত ইত্যাদিও প্রচুর পরিমাণে জন্মে। ফলে এখানে তাঁত, কুটির ও মৃৎশিল্পের প্রসার ঘটেছে।
(ii) খনিজ: পৃথিবীর অনেক দেশ আছে যাদের অর্থনৈতিক মেরুদণ্ড খনিজ সম্পদ উত্তোলন ও রপ্তানির মাধ্যমে বৈদেশিক মুদ্রা আহরণ। বাংলাদেশে বর্তমানে যেসব খনিজ সম্পদ রয়েছে তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো-প্রাকৃতিক গ্যাস, কয়লা, কঠিন শিলা, খনিজ বালু, ধাতব খনিজ, সাদামাটি, সিলিকা বালু, সাধারণ পাথর, চুনা পাথর, ক্লে/শেল এবং খনিজ তেল।

বাংলাদেশের অর্থনীতিতে প্রাকৃতিক পরিবেশের প্রভাব

২০২২-২৩ অর্থবছরে' খাতওয়ারি গ্যাস ব্যবহার হলো বিদ্যুৎ ৪২.০০%, ক্যাপটিভ পাওয়ার ১৮.০০%, ইন্ডাস্ট্রিজ ১৯.০০%, গৃহস্থালী ১১.০০%, সার কারখানা ৫.০০%, সিএনজি ৪.০০%, বাণিজ্যিক ১.০০% এবং চা বাগান ০.১০%।

(iii) বনজ সম্পদ: বনজ সম্পদও কোনো কোনো দেশের বাণিজ্যিক উন্নতিতে সহায়তা করে থাকে। কানাডা, সুইডেন, ব্রাজিল প্রভৃতি দেশ বনজ সম্পদে সমৃদ্ধ হওয়ায় কাঠের ব্যবসায়ে তারা বেশ উন্নত। স্থির বাজার মূল্যে ২০২১-২২ এবং ২০২৩-২৪ (সাময়িক) অর্থবছরে বনজ সম্পদ হতে বাংলাদেশের দেশজ উৎপাদন হলো যথাক্রমে ৫০,১২৯ এবং ৫৫,৩৭৬ কোটি টাকা।

THANK YOU

HSC
একাডেমিক কোর্স

অর্থনীতি ২য় পত্র

অধ্যায় ০১ : বাংলাদেশের অর্থনীতি পরিচয়

টপিক – ০৫ বাংলাদেশের অর্থনীতির কাঠামো

বাংলাদেশের অর্থনীতির কাঠামো

This Topic is important for

MCQ	সৃজনশীল
	ক খ
	গ ঘ

বাংলাদেশের অর্থনীতির কাঠামো

অর্থনৈতিক কাঠামো (Economic Structure): যেকোনো দেশের অর্থনীতিতে সংঘটিত অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের সমষ্টিগত অবদানই দেশের অর্থনীতির ভিত্তি গড়ে তোলে। এসব ভিত্তিকে অর্থনীতিতে 'অর্থনৈতিক কাঠামো বা খাত' (Economic Structure or Sector) বলা হয়। বাংলাদেশের অর্থনীতিতে অর্থনৈতিক কাঠামো বা খাতকে প্রধানত তিন ভাগে ভাগ করা যায়। সংক্ষেপে চার্টের মাধ্যমে অর্থনীতির কাঠামো দেখানো হলো:

চিত্র ১.১ : অর্থনৈতিক খাত

বাংলাদেশের অর্থনীতির কাঠামো

নিম্নে বাংলাদেশের অর্থনীতির কাঠামো বা প্রধান খাতসমূহের বিবরণ উপস্থাপন করা হলো:

১. উৎপাদনভিত্তিক খাত (Production based Sector): উৎপাদনের ভিত্তিতে বাংলাদেশের অর্থনীতির খাতসমূহকে প্রধানত তিনভাগে ভাগ করা যায়। যথা: (ক) কৃষি, (খ) শিল্প ও (গ) সেবা।

(ক) কৃষিখাত (Agriculture Sector): বাংলাদেশের অর্থনীতির প্রধান খাত হলো কৃষি। উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি ও গ্রামীণ অর্থনীতির উন্নয়ন, টেকসই খাদ্য নিরাপত্তা তথা খাদ্যশস্য উৎপাদনে স্বনির্ভরতা অর্জন, কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির মাধ্যমে দারিদ্র্য নিরসন ইত্যাদির মাধ্যমে দেশের আর্থ-সামাজিক ও টেকসই উন্নয়নে কৃষিখাত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। সবার জন্য খাদ্য নিশ্চিত করতে এবং বাংলাদেশকে খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ করতে কৃষিখাতকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত খাত হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে।

দেশে ক্রমবর্ধনশীল জনগোষ্ঠীর খাদ্য ও পুষ্টির চাহিদা পূরণ এবং সেই সাথে খাদ্য নিরাপত্তা জোরদার ও টেকসই করার লক্ষ্যে টেকসই প্রযুক্তিনির্ভর আধুনিক কৃষিব্যবস্থার ওপর বিশেষ দৃষ্টি দেয়া হয়েছে। এ প্রেক্ষিতে কৃষি প্রযুক্তির উদ্ভাবন, উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ; দেশের সর্বত্র মাঠ পর্যায়ে কৃষকদের দোরগোড়ায় কৃষি উপকরণের সহজলভ্যতা নিশ্চিতকরণ; কৃষিঋণ বিতরণ পদ্ধতি সহজীকরণ; কৃষি কার্যক্রমে ভর্তুকি প্রদান; কৃষিবিমার প্রচলন; কৃষি খাতে বেসরকারি বিনিয়োগ বৃদ্ধির সুযোগ সৃষ্টি, ই-কৃষি এবং গবেষণালব্ধ সমন্বিত প্রযুক্তি ব্যবহারের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে।

বাংলাদেশের অর্থনীতির কাঠামো

দেশজ উৎপাদনে কৃষির বিভিন্ন উপ-খাতের প্রবৃদ্ধির হার ও অবদান :

খাত/উপখাত	২০০৫/০৬	২০০৭/০৮	২০১৩/১৪	২০২২/২৩
শস্য ও শাকসবজি	৬.১৭ (১১.১০)	৩.৯৯ (১০.৮৮)	৩.৭৮ (৯.২৮)	৩.১৫ (৫.৩০)
প্রাণিসম্পদ	২.১৫ (২.৩৮)	২.২০ (২.১৯)	২.৮৩ (১.৭৮)	৩.১৭ (১.৮৫)
বনজ সম্পদ	৫.৪৬ (১.৮৬)	৫.২৬ (১.৮২)	৫.০১ (১.৭৪)	৫.১৩ (১.৭০)
মৎস্য সম্পদ	৫.৭৫ (৩.৬৭)	৭.০০ (৩.৭৯)	৬.৩৬ (৩.৬৯)	২.৮০ (২.৪৫)

উৎস : বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো, (অবদান)

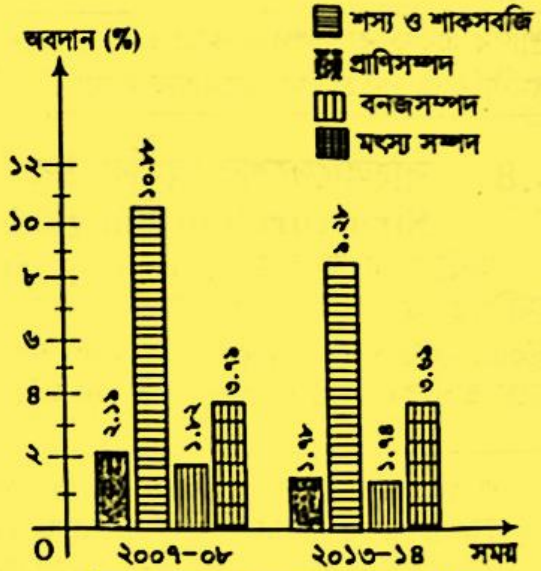

চিত্র : দেশজ উৎপাদনে কৃষির বিভিন্ন উপখাতের খাতওয়ারি অবদান

বাংলাদেশের অর্থনীতির কাঠামো

(খ) শিল্পখাত (Industry Sector): উন্নয়নশীল দেশে দ্রুত ও টেকসই অর্থনৈতিক উন্নয়ন এবং সামাজিক অগ্রগতি অর্জনের একটি অপরিহার্য পূর্বশর্ত হচ্ছে শিল্পায়ন। অর্থনীতির আধুনিকায়ন ও কাঠামোগত রূপান্তর, অর্থনৈতিক ভিত্তির বৈচিত্র্যায়ন, ক্রমবর্ধমান উৎপাদনশীলতা অর্জন, বাহ্যিক ব্যয় সংকোচন, প্রযুক্তিগত অগ্রগতি, ত্বরিত অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জন, কর্মসংস্থান সৃষ্টি এবং জনগণের আয় ও জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন ইত্যাদি হচ্ছে শিল্পোন্নয়নের সর্বজনস্বীকৃত নির্ণায়ক। এজন্য শিল্পায়নকে অধিক গুরুত্বপূর্ণ খাত হিসেবে বিবেচনা করা হয়।

দেশজ উৎপাদনে এ খাতের অবদান ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর হিসাব অনুযায়ী স্থির মূল্যে সার্বিক শিল্পখাতের অবদান ২০১২-১৩ অর্থবছরে ২৯ শতাংশ যা ২০২১-২২ সালে ৩৬.৯২ শতাংশে উন্নীত হয়েছে। ২০২২-২৩ অর্থবছরে সার্বিক শিল্পখাতের (broad industry) অবদান ৩৭.৬৫ শতাংশ।

বাংলাদেশের অর্থনীতির কাঠামো

জাতীয় আয়ে অবদান রাখে এরূপ ১৯টি খাতের মধ্যে (ক) খনিজ ও খনন; (খ) ম্যানুফ্যাকচারিং; (গ) বিদ্যুৎ, গ্যাস, বাষ্প এবং শীতাতপ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা; (ঘ) পানি সরবরাহ, পয়নিষ্কাশন, বর্জ্য ব্যবস্থাপনা ও পুনর্ব্যবহার কার্যক্রম এবং (ঙ) নির্মাণ। এ পাঁচটি খাত-এর সমন্বয়ে সার্বিক শিল্পখাত গড়ে ওঠেছে। এ খাতগুলোর মধ্যে ম্যানুফ্যাকচারিং খাতের অবদান সর্বোচ্চ।* শিল্পখাতের উন্নয়নের লক্ষ্যে ২০০৫ এর শিল্পনীতিকে পরিবর্তন, পরিবর্ধন করে 'জাতীয় শিল্পনীতি ২০১০' প্রণয়ন করা হয়েছে। শিল্পনীতি ২০১০-এর অন্যতম প্রধান লক্ষ্য হলো ক্ষুদ্র ও মাঝারিশিল্পের ব্যাপক বিকাশ, শ্রমঘন শিল্পের পরিকল্পিত ও ভারসাম্যপূর্ণ উন্নয়নকে শিল্পায়নের চালিকাশক্তি হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে। অধিক সংখ্যক নারী শিল্পোদ্যোক্তা সৃষ্টি, কেন্দ্রীকৃত কর্মসংস্থানকে বিকেন্দ্রীকরণের মাধ্যমে দ্রুত কর্মসংস্থান বৃদ্ধি এবং তথ্যপ্রযুক্তির সমন্বয় ঘটিয়ে ২০২১ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে মধ্যম আয়ের দেশে উন্নীতকরণ। শিল্পনীতি ২০১০-এর অপর একটি বৈশিষ্ট্য হলো এতে সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্বকে বেগবান করার জন্য বেসরকারি খাতের দক্ষতা ও গতিশীলতা বজায় রাখার লক্ষ্যে সরকারের সহায়ক এবং তদারকিমূলক ভূমিকা পালনের অঙ্গীকার ব্যক্ত করা হয়েছে।

বাংলাদেশের অর্থনীতির কাঠামো

দেশের অর্থনৈতিক, সামাজিক এবং পরিবেশগত সুরক্ষার মাধ্যমে দেশের সুষম উন্নয়নের লক্ষ্যে সরকার শিল্পনীতি ২০১৬-এ ক্ষুদ্র ও মাঝারিশিল্পখাতকে শিল্প উন্নয়নের প্রধান মাধ্যম হিসেবে গণ্য করে। এর পাশাপাশি সরকার বৃহৎশিল্প ও চিহ্নিত সেবাখাতের উন্নয়নে যথেষ্ট গুরুত্ব আরোপ করেছে। বর্তমানে জাতীয় শিল্পনীতি-২০২২ বাস্তবায়নাধীন। দেশীয় কাঁচামাল ও সম্পদ ব্যবহার করে শ্রমঘন শিল্পায়নের পাশাপাশি চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের প্রযুক্তিগত সুবিধাকে ধারণ করে বাংলাদেশকে অর্থনৈতিকভাবে সমৃদ্ধ করা, খাতভিত্তিক উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি করা এবং উৎপাদিত পণ্যের গুণগতমানের উৎকর্ষ সাধনই জাতীয় শিল্পনীতি, ২০২২ এর মূল উদ্দেশ্য।

বাংলাদেশের অর্থনীতির কাঠামো

খনিজ ও খনন; ম্যানুফ্যাকচারিং; বিদ্যুৎ, গ্যাস, বাষ্প এবং শীতাতপ নিয়ন্ত্রণ; পানি সরবরাহ এবং নির্মাণ—এ খাতগুলোর সমন্বয়ে সার্বিক শিল্পখাত গড়ে ওঠেছে। এ সকল খাতের মধ্যে ম্যানুফ্যাকচারিং খাতের অবদান সর্বোচ্চ। স্থির মূল্যে ২০২৩–২৪ অর্থবছরের সাময়িক হিসাব অনুযায়ী জিডিপিতে ম্যানুফ্যাকচারিং খাতের অবদান দাঁড়িয়েছে ২৫.০৭ শতাংশ। নিম্নের সারণিতে ম্যানুফ্যাকচারিং খাতের জিডিপি ও অর্জিত প্রবৃদ্ধি দেখানো হয়েছে :

(কোটি টাকায়)

শিল্প	২০১৬–১৭	২০১৯–২০	২০২১–২২	২০২৩–২৪*
কুটিরশিল্প	৭৮,৮২৯ (৯.২৯)	১,০০,২৫৭ (৩.৬৭)	১,২২,৮৪৭ (১১.১২)	১,৪৩,৩৫১ (৬.০৮)
ছোট, মাঝারি এবং ক্ষুদ্রশিল্প	১,৪২,১০২ (১০.০৬)	১,৭৯,৩২৫ (২.৬৯)	২,১৪,১২৬ (৪.৮৪)	২,৪৯,৬৯৬ (৬.৮৪)
বৃহৎশিল্প	২,৩১,৩৮৮ (১১.০৮)	২,৯১,০৭২ (১০.৬১)	৩,৭২,৪৫২ (১৫.৬৮)	৪,৩০,৩২০ (৬.৬০)
মোট	৪,৫২,৩১৯ (৭.০৯)	৫,৭০,৬৫৪ (১.৬৮)	৭,০৯,৪২৫ (১১.৪১)	৮,২৩,৩৬৭ (৬.৫৮)

উৎস : বা. অর্থ. সমীক্ষা-২০২৪; (২০১৫–১৬ অর্থবছরের স্থির মূল্যে); বন্ধনীর ভেতরে শতকরা প্রবৃদ্ধির হার। * সাময়িক

(গ) সেবাখাত (Service Sector): অর্থনৈতিক কর্ম যা অবস্তুগত ও অদৃশ্যমান এবং যা মানুষের অভাব পূরণ করে এবং যার জন্য বিনিময় মূল্য দিতে হয়, তাকে সেবা বলে।
বাংলাদেশে ব্যবসায়-বাণিজ্য, পরিবহণ, ব্যাংক-বিমা, গৃহায়ণ, লোক প্রশাসন, ডাক্তার-উকিলের পরামর্শ, শিক্ষকতা, সেবিকার সেবা, শিল্পী ও গায়ক সবই সেবার আওতাভুক্ত এবং প্রভৃতি ক্ষেত্রে সেবাকর্ম উৎপন্ন হয়। এসব সেবা জনগণের নিকট সরবরাহ করা হয় এবং জনগণ সেবা ক্রয় করে তাদের অভাব পূরণ করে। ২০২১-২২ ও ২০২৩-২৪ (সাময়িক) অর্থবছরের জিডিপি'তে সার্বিক সেবাখাতের অবদান দাঁড়িয়েছে যথাক্রমে ৫১.৪৮ ও ৫১.০৪ শতাংশ। ২০২৩-২৪ (সাময়িক) অর্থবছরে সার্বিক সেবাখাতের অন্তর্ভুক্ত পাইকারি ও খুচরা ব্যবসা খাতের জিডিপি'তে অবদান সর্বোচ্চ (১৫.৩২%)। সার্বিক সেবাখাতের অন্তর্ভুক্ত রিয়েল এস্টেট কার্যক্রম খাতের অবদান দ্বিতীয় সর্বোচ্চ (৭.৭৭%)। পরবর্তী অবস্থানসমূহে রয়েছে পরিবহণ ও সংরক্ষণ (৭.২৫%), আবাসন এবং খাদ্য পরিবেশন কার্যক্রম (১.০৭%), তথ্য ও যোগাযোগ (১.২৭%); আর্থিক এবং বিমা কার্যক্রম (৩.০৫%); পেশাদার, বৈজ্ঞানিক এবং প্রযুক্তিগত কার্যক্রম (০.১৮%); প্রশাসনিক ও সহায়তামূলক পরিষেবা কার্যক্রম (০.৭৩%); জনপ্রশাসন ও প্রতিরক্ষা (৩.৫৩%); শিক্ষা (২.৭৪%); মানব স্বাস্থ্য ও সামাজিক সেবা কার্যক্রম (৩.৫৭%); শিল্পকলা ও বিনোদন (০.১৪%) এবং অন্যান্য সেবা কার্যক্রম (৪.৪৩%)। [সূত্র: বা. অর্থ, সমীক্ষা-২০২৪]

বাংলাদেশের অর্থনীতির কাঠামো

পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে মোট দেশজ উৎপাদনে (GDP তে) কৃষি, শিল্প ও সেবাখাতের অবদান উল্লেখ করা হলো—

দেশের নাম	মোট দেশজ উৎপাদনে মূল্যসংযোজন (%)		
	কৃষি	শিল্প	সেবা
বাংলাদেশ	১৯	২৯	৫৩
ভারত	১৮	২৭	৫৫
পাকিস্তান	২২	২৪	৫৪
বেলজিয়াম	১	২২	৭৮
যুক্তরাষ্ট্র	১	২১	৭৭

উৎস : World Development Report—2012

বাংলাদেশের অর্থনীতির কাঠামো

২. মালিকানাভিত্তিক খাত: সরকারি ও বেসরকারি খাত (Ownership oriented Sector: Public and Private Sector): মালিকানার ভিত্তিতে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক খাতসমূহকে প্রধানত দুভাগে বিভক্ত করা যায়। যথা-

(ক) সরকারি খাত ও (খ) বেসরকারি খাত।

(ক) সরকারি খাত (Public Sector): রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন সংস্থাসমূহ বাংলাদেশের অর্থনীতিতে শিল্প, বিদ্যুৎ, গ্যাস,

পরিবহণ, যাতায়াত ও সেবাখাতে উল্লেখযোগ্যভাবে সক্রিয় রয়েছে। সরকার ১৯৭২ সালের ঘোষিত জাতীয়করণ নীতি অনুযায়ী বাংলাদেশের প্রধান প্রধান শিল্পকে জাতীয়করণ করে। সরকারি খাত হিসেবে বাংলাদেশে রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের নাম উল্লেখ করা যায়। সরকারি প্রতিষ্ঠানগুলোর ক্রমাগত লোকসানের প্রেক্ষাপটে ১৯৮২ সালের ঘোষিত শিল্পনীতিতে বেসরকারি পুঁজি বিনিয়োগ আকর্ষণ করার লক্ষ্যে অনুকূল পরিবেশ তৈরি করা হয়। পরবর্তীকালে সরকার কর্তৃক বিরাষ্ট্রীয়করণ নীতি গৃহীত হওয়ায় দেশে বেসরকারি খাত ক্রমশ প্রসার লাভ করতে থাকে।

বাংলাদেশের অর্থনীতির কাঠামো

বর্তমানে রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন সংস্থার অ-আর্থিক (Non-financial) শ্রেণিভুক্ত মোট ৪৯টি রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থাকে ৭টি সেক্টরে বিভক্ত করে নিম্নে দেখানো হলো:

(i) শিল্পখাত (৬টি সংস্থা): বস্ত্রশিল্প, ইস্পাতশিল্প, চিনি ও খাদ্যশিল্প, রসায়নশিল্প, বনশিল্প, পাটকল কর্পোরেশন প্রভৃতি।

(ii) বিদ্যুৎ, গ্যাস ও পানি খাত (৬টি সংস্থা): তেল, গ্যাস ও খনিজ সম্পদ; বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড; ঢাকা পানি সরবরাহ ও পয়ঃনিষ্কাশন কর্তৃপক্ষ; চট্টগ্রাম পানি ও পয়ঃনিষ্কাশন কর্তৃপক্ষ; খুলনা পানি ও পয়ঃনিষ্কাশন কর্তৃপক্ষ; রাজশাহী পানি সরবরাহ ও পয়ঃনিষ্কাশন কর্তৃপক্ষ।

(iii) পরিবহণ ও যোগাযোগ খাত (৮টি সংস্থা): বাংলাদেশ শিপিং কর্পোরেশন, অভ্যন্তরীণ নৌ-পরিবহণ, সড়ক, চট্টগ্রাম বন্দর, মোংলা বন্দর, বাংলাদেশ স্থল বন্দর কর্তৃপক্ষ, বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ এবং পায়রা বন্দর কর্তৃপক্ষ।

(iv) বাণিজ্য খাত (৩টি সংস্থা): বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন, বাণিজ্য (টিসিবি) কর্পোরেশন এবং পল্লিউন্নয়ন ও সমবায়।

(v) কৃষি ও মৎস্য খাত (২টি সংস্থা): বাংলাদেশ মৎস্য এবং কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন।

বাংলাদেশের অর্থনীতির কাঠামো

(vi) নির্মাণখাত (৬টি সংস্থা): রাজধানী, চট্টগ্রাম, রাজশাহী, খুলনা, কক্সবাজার উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ এবং জাতীয় গৃহায়ণ কর্তৃপক্ষ।

(vii) সার্ভিস খাত (১৮টি সংস্থা): বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা কল্যাণ ট্রাস্ট, চলচ্চিত্র উন্নয়ন কর্পোরেশন, পর্যটন কর্পোরেশন, বাংলাদেশ বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষ, বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটিরশিল্প কর্পোরেশন, অভ্যন্তরীণ নৌ পরিবহণ কর্তৃপক্ষ, পল্লি বিদ্যুতায়ন বোর্ড, বাংলাদেশ রপ্তানি প্রক্রিয়াজাতকরণ অঞ্চল কর্তৃপক্ষ, বাংলাদেশ তাঁত বোর্ড, রেশম উন্নয়ন বোর্ড, চা বোর্ড, বাংলাদেশ রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো, বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশন, বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরি কমিশন, বাংলাদেশ স্ট্যান্ডার্ডস এন্ড টেস্টিং ইন্সটিটিউশন, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান নভোথিয়েটার, বাংলাদেশ রেশম গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট, বাংলাদেশ শিল্প কারিগরি সহায়তা কেন্দ্র এবং বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অঞ্চল কর্তৃপক্ষ। মুক্ত বাজার অর্থনীতি চালু করার লক্ষ্যে সরকার শুধুমাত্র রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তামূলক খাত, বৈদেশিক সম্পর্ক বিষয়ক খাত ভিন্ন অন্যসব বেসরকারি মালিকানায় হস্তান্তরের উদ্যোগ নিচ্ছে। ৪৯টি অ-আর্থিক রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থার সরকারি কোষাগারে লভ্যাংশ হিসেবে জমা প্রদান করে ২০২০-২১ অর্থবছরে ১২৭৮.৮১ কোটি টাকা। যা পরবর্তীতে ২০২১-২২ এ হ্রাস পেয়ে দাঁড়ায় ৮৭৯.৮৫ কোটি টাকা এবং ২০২৩-২৪ (২১ এপ্রিল ২০২৪ পর্যন্ত) ১০৩৭.২২ কোটি টাকা।

বাংলাদেশের অর্থনীতির কাঠামো

(খ) বেসরকারি খাত (Private Sector): বাংলাদেশের অর্থনীতিতে যে সমস্ত খাত বেসরকারি উদ্যোগে পরিচালিত হয়, সেগুলোকে বেসরকারি খাতের অন্তর্ভুক্ত ধরা হয়। দেশের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে মুক্ত বাজার ও বেসরকারি খাতের গুরুত্ব ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে। ২০২৩-২৪ (সাময়িক) অর্থবছরে দেশের মোট বিনিয়োগ জিডিপি'র ৩০.৯৮ শতাংশ যার মধ্যে বেসরকারি খাতের অবদান ২৩.৫১ শতাংশ।

বাজার অর্থনীতির কাঠামো জোরদার ও দক্ষ বেসরকারি খাতের বিকাশের লক্ষ্যে সরকারের সংস্কার ও উদারীকরণ কর্মসূচি অব্যাহত রয়েছে। বর্তমান প্রেক্ষিতে-

(i) কৃষি : কৃষির সবগুলো উপখাত (শস্য, মৎস্য, পশু ও বনজ) বেসরকারি নিয়ন্ত্রণ ও ব্যবস্থাপনাধীনে পরিচালিত হচ্ছে। এক্ষেত্রে সরকার শুধুমাত্র পরামর্শ প্রদান, ভর্তুকিসহ নানা প্রকার উৎসাহব্যঞ্জক কাজে নিয়োজিত রয়েছে। সুতরাং খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য প্রত্যক্ষভাবে গ্রামের দরিদ্র, হতদরিদ্র কৃষকই প্রশংসার দাবিদার বলা যায়।

(ii) শিল্প: দরিদ্র, জনবহুল এ দেশে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির মাধ্যমে শিল্পায়ন ও অর্থনৈতিক অগ্রগতি ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে সরকারের কর্মকাণ্ড অব্যাহত রয়েছে। এক্ষেত্রে লোকসানী প্রতিষ্ঠানগুলোকে লাভজনক প্রতিষ্ঠানে পরিণত করার লক্ষ্যে ১৯৯৩ থেকে ফেব্রুয়ারি, ২০১৬ পর্যন্ত মোট ৮১টি শিল্প প্রতিষ্ঠানকে বেসরকারিকরণ করা হয়েছে। বেসরকারি উদ্যোক্তাদের উৎসাহিত করার লক্ষ্যে প্রতি বছর সরকার শিল্পখাতে ব্যবহৃত মৌলিক কাঁচামাল, মধ্যবর্তী পণ্যের কাঁচামাল ও মূলধনী যন্ত্রাংশের ওপর আমদানি পর্যায়ে শুল্কহার হ্রাসের মাধ্যমে দেশীয় শিল্পের বিকাশ সাধনে পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে।

(iii) সেবা: বাংলাদেশের সেবাখাতের উল্লেখযোগ্য অংশ বেসরকারি খাতে পরিচালিত হচ্ছে। এর মধ্যে নৌ ও সড়ক পরিবহণের প্রায় ৯৫%, বেসরকারি বিমান পরিবহণ, টেলিযোগাযোগ, ব্যাংক-বিমা, বিদ্যুৎ উৎপাদন ও বিতরণ, টেলি-মিডিয়া, স্বাস্থ্য, শিক্ষা, প্রশিক্ষণ প্রভৃতি ক্ষেত্রে বেসরকারি খাতের অবদান ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে।

৩. অঞ্চলভিত্তিক খাত গ্রামীণ ও শহুরে খাত (Regional Sectors: Rural and Urban Sectors): অঞ্চল ভিত্তিতে দেশের অর্থনৈতিক খাতকে দু'শ্রেণিতে ভাগ করা যায়। যথা:
(ক) গ্রামীণ খাত ও (খ) শহুরে খাত।
নিম্নে এ খাতগুলোর বিবরণ দেয়া হলো:
(ক) গ্রামীণ খাত (Rural Sectors) : (i) কৃষি: বাংলাদেশ গ্রামপ্রধান দেশ। কৃষি এদেশের গ্রামীণ অর্থনীতির প্রধান খাত। বাংলাদেশের জনসংখ্যার প্রায় ৭৫ ভাগ লোক জীবিকার জন্য প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে কৃষির ওপর নির্ভরশীল। এ খাতের অন্যান্য উপখাতসমূহ হচ্ছে শস্য ও শাকসব্জি উৎপাদন, মৎস্য চাষ, পশু পালন, বনায়ন প্রভৃতি। এছাড়াও পাট, গম, চা, আখ, তুলা, শাক-সবজি, ফলমূল ইত্যাদি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য গ্রামীণ খাত।
(ii) শিল্প: গ্রামীণ শিল্পখাত বলতে প্রধানত ক্ষুদ্র ও কুটিরশিল্পকে বোঝান হয়। বাংলাদেশের মোট দেশজ উৎপাদনে (GDP) ক্ষুদ্র ও কুটিরশিল্পের অবদান মোট শিল্পের অবদানের প্রায় ভাগ। গ্রামীণ শিল্পের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো : তাঁতশিল্প, বাঁশ ও বেতশিল্প, মৃৎশিল্প, স্বর্ণ শিল্প, কাঠশিল্প, কাঁসা ও পিতলশিল্প, বিড়িশিল্প, লবণশিল্প, চামড়াশিল্প, সাবান শিল্প, ধাতবশিল্প, নারিকেলের ছোবড়াশিল্প, মিষ্টিশিল্প, তেলের ঘানি, চাল ও ধান ভাঙার কল প্রধান।

(iii) পল্লি বিদ্যুৎ ও গ্যাস: বিদ্যুৎ উৎপাদন শহুরে খাত হলেও পল্লি বিদ্যুতায়ন কার্যক্রম চালু হওয়ায় সেচ, ক্ষুদ্র ও কুটিরশিল্প ইত্যাদিতে বিদ্যুতের ব্যবহার ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে। এছাড়া বর্তমানে বিদ্যুৎ ও প্রাকৃতিক গ্যাস গ্রামীণ জ্বালানি হিসেবেও ব্যবহার হচ্ছে।

(iv) ব্যাংক বিমা প্রতিষ্ঠান: গ্রামীণ ব্যাংক বাংলাদেশের গ্রামাঞ্চলে ব্যাংকিং কার্যক্রমের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করছে। তদুপরি, কৃষি ব্যাংক ও সমবায় ঋণদান সমিতি, কৃষি উন্নয়নে ঋণদানসহ বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ করছে।

(v) বাবসায়-বাণিজ্য: গ্রামাঞ্চলে কৃষিজাত পণ্য ও শিল্পের কাঁচামাল ক্রয়-বিক্রয় হয়। সাধারণত গ্রাম্য মহাজন ও বেপারিগণ তথা মধ্যস্বত্বভোগীরা এ ব্যবসায়-বাণিজ্য নিয়ন্ত্রণ করে।

(vi) পরিবহণ ও যোগাযোগ: গ্রামীণ অর্থনীতিতে নৌ ও সড়কপথ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। বর্ষাকালে নৌপথের গুরুত্ব অধিক।

(vii) বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা (NGO): বাংলাদেশের গ্রামাঞ্চলে সরকারের নিবন্ধিত ও নিবন্ধনবিহীন অনেক উন্নয়ন সংস্থা ক্ষুদ্র ঋণ বিতরণ, স্বাস্থ্য সেবা, শিক্ষা, ক্ষুদ্র নারী উদ্যোক্তা তৈরিসহ বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে জাতীয় উৎপাদন বৃদ্ধিতে নিয়োজিত। বাংলাদেশের গ্রামীণ দারিদ্র্য দূরীকরণে এ সংস্থার অবদান অনস্বীকার্য।

(খ) শহুরে খাত (Urban Sectors): অর্থনীতির যেসব খাত শহর কিংবা শহরতলীতে অবস্থিত সেগুলোকে শহুরে খাত বলে। নিম্নে প্রধান প্রধান শহুরে খাতগুলো আলোচনা করা হলো:

(i) কৃষি: কৃষি যদিও গ্রামীণ খাতের আওতাভুক্ত, তবুও শহরের আশেপাশে কৃষি সম্প্রসারণ কেন্দ্রের আওতাধীন কৃষিখামার, উদ্যান উন্নয়ন বোর্ডের আওতাধীন কৃষি ফার্ম, গো-খামার, পোলট্রি খামার, নার্সারি প্রভৃতি কৃষি উপখাত শহুরে খাতের অন্তর্ভুক্ত।

(ii) শিল্প: বিদ্যুৎ, পরিবহণসহ অন্যান্য অবকাঠামোগত সুবিধার কারণে শিল্পখাত মূলত শহরকেন্দ্রিক খাত। শহরের আশেপাশে শিল্পনগরী গড়ে ওঠেছে। এখানে মাঝারি ও বৃহৎশিল্পই সর্বাধিক এবং ক্ষুদ্র ও কুটিরশিল্পের পরিমাণ তেমন উল্লেখযোগ্য নয়।

(iii) ব্যাংক ও বিমা প্রতিষ্ঠান: শিল্প ও ব্যবসায়-বাণিজ্যের মূলধনের চাহিদা পূরণের জন্য ব্যাংক ও বিমা প্রতিষ্ঠান শহরের প্রধান প্রাণকেন্দ্র হিসেবে বিবেচিত।

বাংলাদেশের অর্থনীতির কাঠামো

(iv) ব্যবসায়-বাণিজ্য: ব্যাংক ও বিমা প্রতিষ্ঠান যেহেতু শহরকেন্দ্রিক, তাই ব্যবসায়-বাণিজ্য শহরকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হয়।

(v) বিদ্যুৎ ও গ্যাস: বিভিন্ন কল-কারখানায় জ্বালানি হিসেবে বিদ্যুৎ ও গ্যাস ব্যবহৃত হয়। এটি শহরাঞ্চলে অত্যন্ত প্রয়োজনীয় আবাসিক সাহায্যকারী উপাদান। এজন্য এ খাতকে শহুরে খাত হিসেবে গণ্য করা হয়।

(vi) পরিবহণ ও যোগাযোগ: পরিবহণ ও যোগাযোগের বিভিন্ন মাধ্যমসমূহের প্রধান কার্যালয়সমূহ শহরাঞ্চলে অবস্থিত এবং সকল প্রশাসনিক সিদ্ধান্ত শহরাঞ্চলে অবস্থিত দপ্তরসমূহে নেয়া হয়। তাই এ খাতকে শহুরে খাত হিসেবে ধরা হয়।

(vii) শিক্ষা ও চিকিৎসা: প্রাথমিক শিক্ষা থেকে শুরু করে উচ্চ শিক্ষা পর্যন্ত, বিশেষায়িত শিক্ষা, চিকিৎসা সেবা এবং এর আধুনিকায়নের সুফল সবই শহুরে খাতের এক উল্লেখযোগ্য অবদান।

(viii) পেশা ও বিবিধ সেবা: সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠান, কল-কারখানা, ব্যবসায়-বাণিজ্য শহরাঞ্চলে কেন্দ্রীভূত বিধায় চাকরি ও অন্যান্য সেবাকর্ম শহুরে খাত হিসেবে ধরা হয়। এছাড়াও প্রশাসন, আর্থিক প্রতিষ্ঠান, গৃহায়ণ ও অন্যান্য অনেক সেবাকর্ম বাংলাদেশের শহুরে খাতের অন্তর্ভুক্ত।

অর্থনীতির কাঠামো বা খাতসমূহ যেকোনো দেশের অবকাঠামোর ওপর নির্ভরশীল।

THANK YOU

HSC
একাডেমিক কোর্স

অর্থনীতি ২য় পত্র

অধ্যায় ০১ : বাংলাদেশের অর্থনীতি পরিচয়

টপিক – ০৬ অবকাঠামো

অবকাঠামো

This Topic is important for

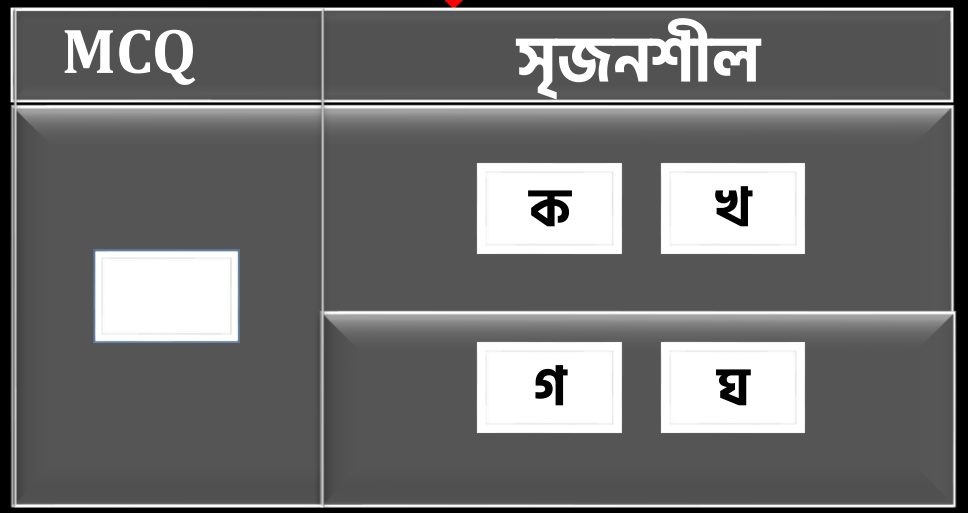

অবকাঠামো

একটি দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের প্রাথমিক পর্যায়ে যেসব উপাদান গড়ে তোলা হয় এবং যেগুলোর ওপর ভিত্তি করে দেশের সার্বিক উন্নয়ন প্রক্রিয়া গতিশীল হয়, সেসব আর্থ-সামাজিক উপাদানকে সমষ্টিগতভাবে 'অবকাঠামো' (Infra-structure) বলা হয়।

শক্তিশালী বা মজবুত ভিত্তি ভিন্ন কোনো দেশের অর্থনৈতিক অবস্থার দ্রুত উন্নয়ন সাধন সম্ভব নয়। দেশের সকল উন্নয়ন কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার মাধ্যমে অর্থনীতিকে গতিশীল করার জন্য কতিপয় মৌলিক উপাদান বা ভিত্তি প্রয়োজন। অতএব, আমরা বলতে পারি, যেসব ভিত্তি দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে বিশেষ অবদান রাখে যার মাধ্যমে অর্থনৈতিক কার্যক্রমকে গতিশীল রাখা হয়, তাকে অবকাঠামো বলে। অবকাঠামো বলতে কোনো দেশের উন্নয়নের প্রাথমিক ভিত্তিকে নির্দেশ করে।

অবকাঠামো

বাংলাদেশে অবকাঠামোর ধারণা (Concept of Infrastructure in Bangladesh): বাংলাদেশে অবকাঠামো বলতে পরিবহণ ও যোগাযোগ, ব্যবসায়-বাণিজ্য, উৎপাদন ধারা, পানি সম্পদ, বিদ্যুৎ শক্তি, সমাজকল্যাণ, শ্রম ও জনশক্তি, অর্থ ও ঋণ পরিস্থিতি তথা সম্পর্কিত অর্থনৈতিক, সামাজিক, রাজনৈতিক ইত্যাদির সামগ্রিক অবস্থাকে বোঝায়। এসব উপাদানকে উন্নত ও দৃঢ়ভাবে গড়ে তোলা হলে উৎপাদনের উপাদানগুলোর গতিশীলতা বৃদ্ধি পায় এবং সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার সম্ভব হয়। উন্নয়নের জন্য আবশ্যক এসব ভিত্তি বা বুনিয়াদকে সামষ্টিক দৃষ্টিকোণ থেকে অর্থনীতিতে অবকাঠামো বলে।

প্রকারভেদ: বাংলাদেশের অবকাঠামোকে তিন ভাগে ভাগ করা যায়। যথা-

(ক) রাজনৈতিক অবস্থার সাথে সম্পর্কিত উৎপাদন ও উন্নয়ন ধারা উপকরণ সংবলিত একটি রূপ।

(খ) অর্থনৈতিক উন্নয়নের সাথে সম্পর্কিত উপাদান যেমন-কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য ইত্যাদির সাথে সংশ্লিষ্ট উন্নয়ন কার্যক্রম।

অবকাঠামো

(গ) অর্থ ও ঋণসংক্রান্ত উন্নয়ন ধারা।

এক্ষেত্রে প্রথমটিকে রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে অবকাঠামো, দ্বিতীয় অবস্থাকে অর্থনৈতিক উন্নয়ন ধারার সাথে সম্পর্কিত অবকাঠামো ও তৃতীয় অবস্থাকে অর্থ ও মুদ্রা বিষয়ক অবকাঠামো বলে।

সাধারণভাবে, প্রসারিত দৃষ্টিকোণ থেকে অবকাঠামোকে দু ভাগে ভাগ করা হয়:

(i) সামাজিক অবকাঠামো (Social Infrastructure)

(ii) অর্থনৈতিক অবকাঠামো (Economic Infrastructure).

অবকাঠামো

সামাজিক অবকাঠামো (Social Infrastructure)

সামাজিক অবকাঠামো হলো ঐ সব সামাজিক বিষয়, যা কোনো দেশের অর্থনৈতিক ও সামাজিক কর্মকাণ্ডে এবং উন্নয়নের ভিত্তি হিসেবে কাজ করে। সামাজিক অবকাঠামোর দ্বারা দেশের জনগণ অধিক দক্ষ, উদ্যমী ও কর্মঠ জনশক্তিতে পরিণত হওয়ার ফলে তারা অর্থনৈতিক ও সামাজিক জীবনে বিশেষ অবদান রাখতে পারে।

সামাজিক অবকাঠামোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো শিক্ষা, জনস্বাস্থ্য, সুযোগ-সুবিধা, প্রশিক্ষণ ও গবেষণা, বাসস্থান, পরিবার কল্যাণ, ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক চেতনা প্রভৃতি। এগুলো সমাজের মানুষের উদ্যম, দৃষ্টিভঙ্গি, দক্ষতা ও আচরণকে প্রভাবিত করে।

অতএব আমরা বলতে পারি, দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের ওপর প্রভাব বিস্তারকারী এসব সামাজিক উপাদানগুলোকে সামাজিক অবকাঠামো বলে।

অবকাঠামো

অর্থনৈতিক অবকাঠামো (Economic Infrastructure)

অর্থনৈতিক অবকাঠামো যেকোনো দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য একটি অপরিহার্য পূর্বশর্ত। যেসব অর্থনৈতিক উপাদান অর্থনৈতিক উন্নয়নের ভিত্তি হিসেবে কাজ করে এবং উন্নয়ন প্রক্রিয়াকে গতিশীল রেখে উন্নয়ন কার্যক্রমকে অব্যাহত রাখে, সেসব উপাদানের সমষ্টিকে অর্থনৈতিক অবকাঠামো বলে।

অর্থনৈতিক অবকাঠামোকে অর্থনৈতিক বুনিয়াদ নামে অভিহিত করা হয়। কেননা, এর ওপর দেশের উৎপাদনক্ষমতা ব্যাপকভাবে নির্ভরশীল। প্রসারিত অর্থে সুষ্ঠু যাতায়াত ও যোগাযোগব্যবস্থা, যেমন- রেলপথ, সড়কপথ, নৌপথ, আকাশপথ, ডাক, তার, টেলিফোন এবং বিদ্যুৎ সরবরাহ, বাঁধ, সেতু, শক্তি সম্পদ, পানি সরবরাহ প্রভৃতিকে অর্থনৈতিক অবকাঠামোর আওতায় ধরা হয়। যেমন: বঙ্গবন্ধু সেতু, পদ্মাসেতু, রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র, ২৫০ কিলোমিটার দীর্ঘ পৃথিবীর দীর্ঘতম মেরিন ড্রাইভ, কর্ণফুলী নদীর নিচে টানেল এবং এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে ও গভীর সমুদ্র বন্দর নির্মাণ এসবই অর্থনৈতিক অবকাঠামোর উদাহরণ হিসেবে বিবেচ্য। যেমন: ২৫ জুন, ২০২২ উদ্বোধনকৃত স্বপ্নের পদ্মা সেতু বাংলাদেশের দক্ষিণাঞ্চলে ব্যাপক উন্নয়নের সূচনা করবে। জাতীয় অর্থনীতিকে করবে সমৃদ্ধ। বিভিন্ন গবেষণায় অনুমান করা হয়েছে, এর মাধ্যমে GDP প্রবৃদ্ধি বাড়বে কমপক্ষে ১.২ শতাংশ এবং দারিদ্র্যবিমোচন হবে প্রতি বছর ০.৮৪ শতাংশ হারে।

অবকাঠামো

বৈশিষ্ট্য: অর্থনৈতিক অবকাঠামোর বৈশিষ্ট্যসমূহ হচ্ছে-

(এক) দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের গতি ত্বরান্বিত করে।

(দুই) পণ্যদ্রব্য এবং সেবার যোগান অব্যাহত ও স্থিতিশীল রাখতে সহায়তা করে।.

(তিন) মূল্যের স্থিতিশীলতা বজায় রাখতে সহায়তা করে।

(চার) উৎপাদনে ব্যবহৃত উপাদানসমূহের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি করে।

(পাঁচ) রাষ্ট্রের প্রশাসনব্যবস্থার সহায়ক শক্তি হিসেবে সহায়তা করে।

(ছয়) জনগণের মাঝে সুস্থ উপলব্ধির ক্ষমতা বৃদ্ধি করে।

(সাত) দেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব মজবুত করে।

THANK YOU

HSC
একাডেমিক কোর্স

অর্থনীতি ২য় পত্র

অধ্যায় ০১ : বাংলাদেশের অর্থনীতি পরিচয়

টপিক – ০৭ বাংলাদেশের অর্থনীতির বৈশিষ্ট্য

বাংলাদেশের অর্থনীতির বৈশিষ্ট্য

This Topic is important for

MCQ	সৃজনশীল	
	ক	খ
	গ	ঘ

বাংলাদেশের অর্থনীতির বৈশিষ্ট্য

গ্রামভিত্তিক কৃষিপ্রধান দেশ বাংলাদেশ। স্বাধীনতা-উত্তর চার দশক পর নতুন সহস্রাব্দে বাংলাদেশের অর্থনীতিতে তেজিভাব লক্ষ্য করা যাচ্ছে। বিশ্বে বাংলাদেশ উন্নয়নের একটি মডেল হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে। মানবসম্পদের উন্নয়ন ও দক্ষতা বৃদ্ধি, মাথাপিছু আয় বৃদ্ধি, বৈদেশিক বিনিয়োগ বৃদ্ধি, আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের লক্ষ্যে সরকারি-বেসরকারি বিনিয়োগ বৃদ্ধি ইত্যাদির ফলে দারিদ্র্য দূরীকরণের মাধ্যমে টেকসই উন্নয়নের দিকে দেশ অগ্রসর হচ্ছে। এরূপ পরিস্থিতিতে ১ জুলাই ২০১৫ সালে বিশ্বব্যাংক বাংলাদেশকে নিম্ন আয়ের দেশ থেকে নিম্ন মধ্যম আয়ের দেশ হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছে। আবার জাতিসংঘ মার্চ ২০১৮ সময়ে বাংলাদেশকে উন্নয়নশীল দেশ হিসেবে প্রাথমিক স্বীকৃতি দিয়েছে। যদিও উন্নয়নশীল দেশ এর চূড়ান্ত স্বীকৃতি পাওয়া যাবে ২০২৪ সালে।

বাংলাদেশের অর্থনীতির বৈশিষ্ট্য

নিম্নে বাংলাদেশের বর্তমান অর্থনৈতিক অবস্থা উপস্থাপন করা হলো:

১. কৃষির অবদান : কৃষি বাংলাদেশের অর্থনীতিতে একক বৃহত্তম খাত। ২০২৩-২৪০ সালের হিসাব অনুযায়ী মোট দেশজ উৎপাদনে সার্বিকভাবে কৃষিখাতের (শস্য ও শাকসব্জি, প্রাণিসম্পদ, মৎস্য সম্পদ ও বনজ সম্পদ) সমন্বিত অবদান শতকরা প্রায় ১১.০২ ভাগ। শস্য ও শাকসব্জি, প্রাণিসম্পদ এবং বনজসম্পদ উপখাতসমূহের সমন্বয়ে কৃষি ও বনজ খাতের অবদান জিডিপিতে ৮.৬৪ শতাংশ, মৎস্য খাতের অবদান GDP এর ২.৩৮ শতাংশ। ২০২৩ সালের [Labour Forch Survey-2023] সমীক্ষায় দেখা যায়, এখনো দেশের ৪৫.০০% জনশক্তি কৃষিক্ষেত্রে নিয়োজিত।

২. কৃষির ক্রমোন্নতি: বর্তমানে কৃষি উৎপাদনব্যবস্থায় আধুনিকায়নের বাতাস বইছে। উৎপাদকগণ পূর্বাপেক্ষা অধিক সচেতন ও দায়িত্ববান। তাই গুরুত্ব অনুভব করে তারা উন্নত বীজ, সার, কীটনাশক, সেচ সুবিধার বন্দোবস্ত করে অধিক উৎপাদনে মনোনিবেশ করছে।

বাংলাদেশের অর্থনীতির বৈশিষ্ট্য

৩. শিল্পের উন্নয়নে কর্মসূচি গ্রহণ: বর্তমানে সরকার শিল্প স্থাপনে অধিক উৎসাহপূর্ণ কর্মসূচি গ্রহণ করেছে। নতুন উদ্যোক্তা সৃষ্টিতে সরকার সুপরামর্শ, দেশের বিভিন্ন স্থানে রপ্তানিমুখী অর্থনৈতিক অঞ্চল নির্মাণ, বিনিয়োগ নীতি সহজীকরণ, ট্যাক্স হলিডে ঘোষণা, শিল্প নিরাপত্তা বৃদ্ধি, মূলধনের অবাধ প্রবাহ নিশ্চিতকরণ, বৈদেশিক বিনিয়োগকারীদেরকে আকর্ষণের জন্য নানা প্যাকেজ সুবিধা প্রদান, বিদেশে বাজার সৃষ্টিতে নানা দেশের সাথে বন্ধুত্ব স্থাপন ও চুক্তি সম্পাদন করছে। এর সুফলও পাওয়া যাচ্ছে।

দেশজ উৎপাদনে শিল্পখাতের অবদান, (%)

২০০৫–০৬	২০০৯–১০	২০১৬–১৭	২০১৭–১৮	২০২১–২২	২০২৩–২৪*
২৫.৩৯%	২৬.৭৮%	৩২.৪২%	৩৩.৬৬%	৩৬.৯২%	৩৭.৯৫%

* সাময়িক

বাংলাদেশের অর্থনীতির বৈশিষ্ট্য

৪. জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার হ্রাস: ১৯৯১ সালের হিসাব অনুযায়ী জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ২.১৭% এবং বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা-২০২৪ অনুযায়ী জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার হ্রাস পেয়ে ১.৩৩% এ উপনীত হয়।

৫. বেকার সমস্যা: বাংলাদেশে তীব্র বেকার সমস্যা বিরাজমান। জাতীয় সংসদে শ্রম ও কর্মসংস্থান প্রতিমন্ত্রীর তথ্যানুযায়ী দেশে বেকারের সংখ্যা ২৬ লাখ ৭৭ হাজার। এর মধ্যে শিক্ষিত বেকারের সংখ্যা ১০ লাখ ৪৩ হাজার (৪০%)।। জনসংখ্যা বৃদ্ধির তুলনায় বাংলাদেশে সঞ্চয় ও মূলধন গঠনের হার কম। যার ফলে বিনিয়োগ আশানুরূপ নয়। তাই বেকার সমস্যার তেমন উন্নতি হয়নি। তবে বৈদেশিক বিনিয়োগকারিগণ যেহেতু এদেশে বিনিয়োগ করতে আগ্রহ প্রকাশ করছে, সরকারি ও বেসরকারি উদ্যোগে EPZ এবং 'অর্থনৈতিক অঞ্চল' চালু হচ্ছে, ন্যাশনাল সার্ভিস প্রবর্তনের ফলে আশা করা যায় অদূর ভবিষ্যতে এ সমস্যা হ্রাস পাবে।*।

৬. মাথাপিছু আয় (Per capita income): কোনো নির্দিষ্ট এলাকার নির্দিষ্ট সময় (অর্থবছর) এর মোট আয়কে উক্ত এলাকার মোট জনসংখ্যা দ্বারা ভাগ করে এ গড় মান নির্ণয় করতে হয়। It is calculated by dividing the areas total income by its total population.

বাংলাদেশের অর্থনীতির বৈশিষ্ট্য

মাথাপিছু আয়ের প্রবাহ চিত্র : (মার্কিন ডলার)

বছর	১৯৭২	২০০০-০১	২০০৫-০৬	২০১৫-১৬	২০১৬-১৭	২০১৭-১৮	২০২৩-২৪
মাথাপিছু আয়	৫০-৭০	৩৭৪	৫৪৩	১৪৬৫	১৬১০	১৭৫২	২৭৮৪

* সাময়িক

* বা. অর্থ. সমীক্ষা : ২০২৪।

বাংলাদেশের অর্থনীতির বৈশিষ্ট্য

৭. জীবনযাত্রার মান: জীবনযাত্রার মান পূর্বাপেক্ষা উন্নত হয়েছে। বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা, ২০২৪ এর হিসাব অনুযায়ী জীবনযাত্রার মান পূর্বের চেয়ে উন্নত হওয়ায় প্রত্যাশিত গড় আয়ুষ্কাল' বৃদ্ধি পেয়ে পুরুষ ৭০.৮, মহিলা ৭৩.৮ ও উভয় ৭২.৩ বছর হয়েছে। নিরাপদ সুপেয় (টিউবওয়েলের) পানি গ্রহণকারী ৯৮.২%। সাক্ষরতার হার ৭৭.৯%।

পরিসংখ্যান মতে, ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের মানুষের গড় আয়ু ছিল ৪৪ থেকে ৪৫ বছর। গত ৪৫ বছরে বাংলাদেশের মানুষের গড় আয় বেড়েছে ২৬-২৭ বছর। এই একই সময়ে বৈশ্বিক গড় আয়ু বেড়েছে মাত্র ১৩ বছর (৫৯ থেকে ৭২ বছর) এবং দক্ষিণ এশিয়ার গড় আয়ু বেড়েছে মাত্র ১৩ বছর (৫৩ থেকে ৬৬ বছর)। গড় আয়ু বৃদ্ধির ক্ষেত্রে দেশের সার্বিক উন্নয়নের মাধ্যমে মানবকল্যাণ বৃদ্ধির বিষয়টি জড়িত। এর মধ্যে মাথাপিছু আয় বৃদ্ধি, দারিদ্র্য পরিস্থিতির ঈর্ষণীয় উন্নয়ন, শিক্ষা ও স্বাস্থ্যসেবার দৃশ্যমান উন্নতি, নারীর ক্ষমতায়ন, দেশের অবকাঠামো উন্নয়ন, স্বাস্থ্য বিষয়ে জনসচেতনতা বৃদ্ধি ইত্যাদি বিষয়গুলোর অগ্রগতি প্রয়োজন।

বাংলাদেশের অর্থনীতির বৈশিষ্ট্য

৮. প্রাকৃতিক ও মানবসম্পদের ব্যবহার বৃদ্ধি: বর্তমানে প্রাকৃতিক সম্পদ আবিষ্কার ও ব্যবহার পূর্বাপেক্ষা বৃদ্ধি পেয়েছে। তৈল, গ্যাস ও খনিজ সম্পদে সমৃদ্ধ 'বাংলাদেশ' নামটি পৃথিবীতে যথেষ্ট সুনাম ও পরিচিতি লাভ করেছে। বর্তমানে প্রাকৃতিক গ্যাস বাংলাদেশের মোট বাণিজ্যিক জ্বালানি ব্যবহারের শতকরা প্রায় ৫৪-৫৯ ভাগ পূরণ করে।*। এছাড়া মানবসম্পদ উন্নয়নের লক্ষ্যে শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ, নারী ও শিশু উন্নয়ন, যুব ও ক্রীড়া উন্নয়নসহ বিভিন্ন কর্মকাণ্ডে সরকারি ও বেসরকারিভাবে বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়।

৯. বিনিয়োগযোগ্য পুঁজি প্রবাহ বৃদ্ধি: বাংলাদেশে বিনিয়োগের পরিমাণও উন্নত দেশের তুলনায় অনেক কম। বর্তমানে দেশে বিনিয়োগ বৃদ্ধির লক্ষ্যে সরকার অনেক উদ্দীপনামূলক, সহযোগিতামূলক নীতি ঘোষণা করেছে। এর ফলে দেশি ও বিদেশি বিনিয়োগকারিগণ আকর্ষিত হয়ে বিনিয়োগের পরিমাণ বৃদ্ধি করছে। ১৯৯৫-৯৬ অর্থবছরে মোট বিনিয়োগের হার ছিল জিডিপির ১৯.৯৯ শতাংশ। পক্ষান্তরে ২০২৩-২৪ (সাময়িক) অর্থবছরে জাতীয় বিনিয়োগ হার বৃদ্ধি পেয়ে ৩০.৯৮ শতাংশে উন্নীত হয়।

বাংলাদেশের অর্থনীতির বৈশিষ্ট্য

১০. খাদ্য সমস্যা ও পুষ্টিহীনতা: সবার জন্য খাদ্য নিশ্চিত করার মাধ্যমে বাংলাদেশকে খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ করতে কৃষিখাতকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার প্রাপ্ত খাত হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। অধিক জনসংখ্যা কিন্তু সে তুলনায় কৃষি উৎপাদন কম হওয়ায় বাংলাদেশে খাদ্য ও পুষ্টির ঘাটতি বিদ্যমান। বর্তমানে উন্নত সার, বীজ এবং প্রযুক্তি ব্যবহারের ফলে দিন দিন শস্য উৎপাদনের পরিমাণ বৃদ্ধি পাচ্ছে। ২০০৯ সালে খাদ্যশস্যের উৎপাদন ছিল ৩ কোটি ৩৮ লক্ষ ৩৩ হাজার মে. টন। ২০২২-২৩ অর্থবছরে তা উন্নীত হয় ৪৬৭.০৪ লক্ষ মে. টনে। ২০২৩-২৪০ অর্থবছরে উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা ধরা হয় ৫১৩.৪৫ লক্ষ মে. টন। আমাদের দৈনন্দিন খাদ্যে প্রাণিজ আমিষের প্রায় ৬২.৫৮% আসে মাছ থেকে। সরকারের গৃহীত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির (ADP) মাধ্যমে ধীরে ধীরে খাদ্যসমস্যা ও পুষ্টিহীনতা হ্রাসের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে।

১১. অর্থনৈতিক ও সামাজিক অবকাঠামো বাংলাদেশের অর্থনৈতিক ও সামাজিক অবকাঠামোর উন্নয়ন ধীরে ধীরে প্রসার লাভ করছে।

১২. বৈদেশিক বাণিজ্য: বৈদেশিক বাণিজ্যে পূর্বে প্রচুর ঘাটতি ছিল। বর্তমানে বিভিন্ন বন্ধুদেশে আমাদের দেশের পণ্যদ্রব্যের রপ্তানি বৃদ্ধি পাবার কারণে বাণিজ্য ঘাটতি হ্রাস পাচ্ছে। তবে এখনো বৈদেশিক বাণিজ্য অনুকূলে আসেনি।

বাংলাদেশের অর্থনীতির বৈশিষ্ট্য

১৩. বৈদেশিক সাহায্যের ওপর নির্ভরশীলতা: বর্তমানে বৈদেশিক সাহায্যের ওপর নির্ভরশীলতার হার হ্রাস পাচ্ছে। প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় (১৯৭৩-৭৮) অভ্যন্তরীণ সম্পদের যোগান ছিল ২৩ ভাগ এবং চতুর্থ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় (১৯৯০-৯৫) অভ্যন্তরীণ সম্পদের সমাবেশ করা হয় ৪৮ ভাগ। পঞ্চম-পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় (১৯৯৭-২০০২) অভ্যন্তরীণ সম্পদের সমাবেশ ধরা হয় ৬১.৪৫%। অর্থাৎ বৈদেশিক সাহায্যের ওপর নির্ভরশীলতা ক্রমান্বয়ে হ্রাস পাচ্ছে। এটিকে নিজস্ব উৎসের ওপর অধিক নির্ভরতার ইতিবাচক অগ্রগতি হিসেবে চিহ্নিত করা যায়।

১৯৭২-৭৩ সালে এডিপিতে মোট বরাদ্দের ৭৫ ভাগই ছিল বৈদেশিক সাহায্যনির্ভর। বর্তমানে এর আকার, আয়তন বৃদ্ধির সাথে সাথে অভ্যন্তরীণ সম্পদের পরিমাণও বৃদ্ধি পেয়েছে। যেমন:

সাল	২০০৬–০৭	২০১৬–১৭	২০২১–২২	২০২২–২৩*	২০২৩–২৪*
ADP এর শতকরা হিসেবে অভ্যন্তরীণ সম্পদ	৫৩.১৫	৭০.১৯	৬৪.৫১	৬১.৭১	৫৯.৯০

* বা. অর্থ. সমীক্ষা-২০২৪

বাংলাদেশের অর্থনীতির বৈশিষ্ট্য

১৪. শিক্ষার হার: দেশে বর্তমানে শিক্ষার হার বৃদ্ধি পেয়েছে। সাক্ষরতার হারও বৃদ্ধি পেয়েছে। ইতোমধ্যে অনেক জেলাকে সরকার 'নিরক্ষরতা মুক্ত' ঘোষণা করেছে। ২০২৩ সালের হিসাব অনুযায়ী বাংলাদেশে সাক্ষরতার হার ৭৭.৯% এ উন্নীত হয় (বা. অর্থ, সমীক্ষা-২০২৪)।

১৫. সামাজিক কুসংস্কার: বর্তমানে শিক্ষার হার বৃদ্ধির সাথে মানুষের জীবনযাত্রার মানের উন্নতির ফলে সামাজিক নানা কুসংস্কার নিয়ন্ত্রণ হয়েছে। বর্ণবৈষম্য, বিভিন্ন ধরনের গোঁড়ামি, বাল্য ও বহু বিবাহ অনেক হ্রাস পেয়েছে।

১৬. কারিগরি জ্ঞানের প্রসার দেশে বর্তমানে যুবকদের মধ্যে বৈজ্ঞানিক ও কারিগরি জ্ঞানের যথেষ্ট প্রসার ঘটছে। কম্পিউটার শিক্ষা গ্রহণ করে এর নানামুখী ব্যবহারের প্রতি যুবকদের আগ্রহ বৃদ্ধি পাচ্ছে।

১৭. মূল্যস্ফীতি : মূল্যস্ফীতির সাথে দেশের সামগ্রিক অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের একটা ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বিদ্যমান। কোভিড-১৯ পরবর্তী ইউক্রেন যুদ্ধ বিশ্বব্যাপী খাদ্য ও জ্বালানি ঘাটতি, কর্মসংস্থানের সমস্যা, জীবনযাত্রার ব্যয় মেটানোর নিত্যদিনের সংগ্রামে লাগামহীন মূল্যস্ফীতি বিদ্যমান। পরিস্থিতি মোকাবেলায় বিশ্বজুড়ে বিভিন্ন দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাংকসমূহ মুদ্রাস্ফীতির রাশ টানার চেষ্টা করছে। ২০২৪-২৫ অর্থবছরের ঘোষিত বাজেটে মূল্যস্ফীতির হার ৬.৫% এর মধ্যে থাকবে মর্মে আশা ব্যক্ত করা হয়। যদিও এপ্রিল ২০২৪ এ সাধারণ মূল্যস্ফীতি ৯.৭৪, খাদ্যে ১০.২২ এবং খাদ্যবহির্ভূত ৯.৩৪ শতাংশ ছিল।

বাংলাদেশের অর্থনীতির বৈশিষ্ট্য

১৮. বেসরকারি খাত উন্নয়ন: দেশের অর্থনীতির অন্যতম চালিকাশক্তি বেসরকারি খাত। শিল্পের প্রসার, রপ্তানি খাত সম্প্রসারণ ও কর্মসংস্থান সৃষ্টির মাধ্যমে আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ও উচ্চ প্রবৃদ্ধির ধারা বজায় রেখে টেকসই উন্নয়নের অভীষ্ট (SDG) অর্জনে বেসরকারি খাত অত্যন্ত ইতিবাচক ও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। বাংলাদেশকে ২০৩১ সালের মধ্যে মধ্যম আয়ের দেশ এবং ২০৪১ সালের মধ্যে একটি জ্ঞানভিত্তিক স্মার্ট এবং উন্নত অর্থনীতিতে রূপান্তরের জন্য বেসরকারি খাত অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বেসরকারি বিনিয়োগ সহায়ক পরিবেশ সৃষ্টি করতে সরকার বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ গঠনসহ ব্যাপক সংস্কার কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে। বিশ্বব্যাংক ও ইন্টারন্যাশনাল ফাইন্যান্স কর্পোরেশন (IFC) প্রকাশিত 'ইজি অব ডুয়িং বিজনেস' ২০২০ এর প্রতিবেদন অনুযায়ী ব্যবসায় মানদণ্ডের উন্নয়নে গ্লোবাল র‍্যাংকিংয়ে ১৯০টি দেশের মধ্যে বাংলাদেশের অবস্থান ২০১৯ সালের ১৭৬তম হতে উন্নীত হয়ে ১৬৮তম, বিনিয়োগকারীদের সুরক্ষার ক্ষেত্রে ৭২তম, ঋণপ্রাপ্তির ক্ষেত্রে ১১৯তম ব্যবসা শুরুর ক্ষেত্রে ১৩১তম এবং কর প্রদানের ক্ষেত্রে ১৫১তম।

বাংলাদেশের অর্থনীতির বৈশিষ্ট্য

১৯. আর্থিক খাত সংস্কার: দেশের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে আর্থিক খাতের অধিকতর কার্যকর ভূমিকা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে ১৯৯৬ সালের ডিসেম্বরে সমাপ্ত আর্থিক খাত সংস্কার কর্মসূচির আওতায় গৃহীত পদক্ষেপসমূহের বাস্তবায়ন ২০০১/২০০২ অর্থবছরেও অব্যাহত ছিল। বর্তমানে এ সংস্কার কর্মসূচিকে আরও সময়োপযোগী করা হয়েছে। প্রত্যাশিত আর্থ-সামাজিক প্রবৃদ্ধি অর্জনে আর্থিক খাতের ভূমিকা বৃদ্ধির লক্ষ্যে বহুবিধ উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। যেমন-

(i) টাকার বাজারভিত্তিক ভাসমান বিনিময় হার চালু করা হয়েছে।

(ii) ঋণ বাজারে উচ্চ 'সুদ হারের জড়তা' (interest rate rigidity) নিরসন করে সুদ হার নিম্নমুখী করার বিশেষ উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। উৎপাদনশীল খাতে ঋণ প্রবাহ বৃদ্ধি এবং আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে আরো গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালনের লক্ষ্যে ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহকে সুদের হার যুক্তিসঙ্গত পর্যায়ে নির্ধারণের জন্য উৎসাহিত করা হচ্ছে।

(iii) ব্যাংকিং খাতকে আরও শক্তিশালী করে একে আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতামূলক স্তরে উন্নীত করা এবং মূলধন সংরক্ষণ আরও ঝুঁকি-সহনশীল ও সুদৃঢ় করার উদ্যোগ নেয়া হয়েছে।

(iv) বাংলাদেশ ব্যাংক আধুনিকীকরণ, সার্বভৌম ঋণমান নির্ধারণ, মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ আইন, ২০১২; মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ বিধিমালা, ২০১৩; অর্থ ঋণ আদালত আইন; সন্ত্রাস বিরোধী (সংশোধন) আইন, ২০১৩; আর্থিক গোয়েন্দা ইউনিট (FIU) চালু করা হয়েছে। এছাড়া বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহের ন্যূনতম মূলধন-এর পাশাপাশি আপদকালীন মূলধন সংরক্ষণ নীতিমালাও চালু করা হয়েছে। আমার।

বাংলাদেশের অর্থনীতির বৈশিষ্ট্য

২০. রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা: বাংলাদেশে রাজনৈতিক স্থিতিশীলতার যথেষ্ট অভাব রয়েছে। এ কারণে সঠিক উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন সম্ভব হচ্ছে না। রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা বিদ্যমান থাকলে উন্নয়নের গতি দ্রুত হওয়ার মাধ্যমে কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে পৌঁছানো সহজ হতো।

২১. সামাজিক নিরাপত্তামূলক খাত: সরকার জনকল্যাণে, দরিদ্রতা লাঘবে বিভিন্ন কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছে; যেমন:

(i) দরিদ্র বয়োজ্যেষ্ঠদের জন্য বয়স্ক ভাতা।

(ii) গৃহহীন দরিদ্রদের ঋণ ও অনুদান প্রদানের জন্য গৃহায়ণ তহবিল গঠন।

(iii) সামাজিক সুরক্ষার আওতায় গর্ভধারিণী হতদরিদ্র মা'কে প্রতি মাসে ভাতা প্রদান।

(iv) দেশে বেকার যুবকদের 'কর্মসংস্থানের লক্ষ্যে কর্মসংস্থান ব্যাংক' স্থাপন এবং ন্যাশনাল সার্ভিস প্রবর্তনসহ নানা আত্মকর্মসংস্থানমূলক প্রকল্প গ্রহণ।

বাংলাদেশের অর্থনীতির বৈশিষ্ট্য

উপরিউক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে সিদ্ধান্ত নেয়া যায় যে, গত চার দশকে বাংলাদেশের কৃষিজমির পরিমাণ হ্রাস পেলেও ফলন অনেক বেড়েছে, জনসংখ্যা অনেক বাড়লেও মাথাপিছু আয়, গড় আয়ু, জীবনযাত্রার মান, শিল্পায়ন অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে, বেকারত্ব হ্রাস পেয়েছে। দেশজ উৎপাদনে শিল্প ও সেবাখাতের অবদান কৃষি অপেক্ষা বৃদ্ধি পেয়েছে। অর্থাৎ বাংলাদেশের অর্থনীতি স্থবির নয় আবার উন্নতও নয়। গতিশীল কর্মসূচি গ্রহণ ও বাস্তবায়ন হচ্ছে। তাই বলা যায়, বাংলাদেশের অর্থনীতিতে কাঠামোগত পরিবর্তন (পরিমাণগত ও গুণগত কাঙ্ক্ষিত অর্থনৈতিক পরিবর্তন) সাধিত হচ্ছে। এ কারণে বাংলাদেশকে উন্নয়নশীল দেশ' বলাই অধিক যুক্তিযুক্ত।

জাতিসংঘে বাংলাদেশের অন্তর্ভুক্তির ২৫তম বার্ষিকী উপলক্ষ্যে দেওয়া এক বাণীতে তৎকালীন জাতিসংঘ মহাসচিব কফি আনান বলেন, "বাংলাদেশ উন্নয়নশীল দেশগুলোর কাছে এ উদাহরণ তুলে ধরতে পেরেছে যে, শুধুমাত্র মাথাপিছু মোট জাতীয় উৎপাদন (GNP) বৃদ্ধিই উন্নয়ন নয়, বরং শিক্ষা, গণতন্ত্র, মানবাধিকার এবং দরিদ্র জনগোষ্ঠীর আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকারও উন্নয়নের অন্তর্ভুক্ত।"

বাংলাদেশের অর্থনীতির বৈশিষ্ট্য

তিনি আনন্দের সাথে আরও বলেন, "বাংলাদেশের মতো একটি দেশকে যেকোনো আন্তর্জাতিক সংস্থাই সদস্য হিসেবে পেতে আগ্রহী হবে।"

মুজিব জন্মশতবার্ষিকী ও স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তীর জাতীয় অনুষ্ঠানে বিভিন্ন দেশের রাষ্ট্রপ্রধানেরা উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেছেন। এ উপলক্ষ্যে US প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন বলেছেন, 'Bangladesh is an example of economic progress and a country of great hope and opportunity.'

ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী বরিস জনসন বলেন, 'Bangladesh is one of the fastest growing economics in the world and the UK and Bangladesh share the ambition to create an ever more prosperous and environmentally-sustainable future.'

THANK YOU

HSC
একাডেমিক কোর্স

অর্থনীতি ২য় পত্র

অধ্যায় ০১ : বাংলাদেশের অর্থনীতি পরিচয়

টপিক – ০৮ বাংলাদেশের অর্থনীতির গতিধারা

বাংলাদেশের অর্থনীতির গতিধারা

This Topic is important for

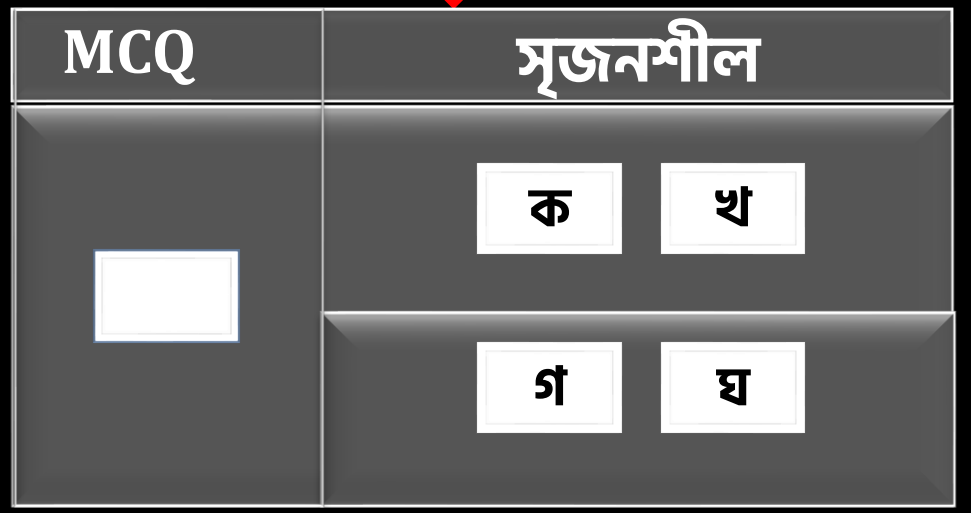

বাংলাদেশের অর্থনীতির গতিধারা

স্বাধীনতার ঠিক পরপরই দেশের অর্থনীতি কেমন ছিল? ১৯৭২ সালের ২৫ সেপ্টেম্বর বিশ্বব্যাংক একটি রিপোর্ট করেছিল যা হলো-'সবচেয়ে ভালো পরিস্থিতিতেও বাংলাদেশের উন্নয়ন সমস্যাটি অত্যন্ত জটিল। এখানকার মানুষ অত্যন্ত দরিদ্র, মাথাপিছু আয় ৫০ থেকে ৭০ ডলার এর মধ্যে, যা গত ২০ বছরে বাড়েনি, জনসংখ্যার প্রবল আধিক্য এখানে, প্রতি বর্গকিলোমিটারে ১ হাজার ৪০০ মানুষ বাস করে, তাদের জীবনের আয়ুষ্কাল অনেক কম, এখনো তা ৫০ বছরের নিচে, বেকারত্বের হার ২৫ থেকে ৩০ শতাংশের মধ্যে এবং জনসংখ্যার বড় অংশই অশিক্ষিত।'

নরওয়ের বিখ্যাত অর্থনীতিবিদ জাস্ট ফাল্যান্ড এবং অন্য একজন অর্থনীতিবিদ জে. আর, পার্কিনসন ১৯৭৬ সালে দু'জনে ২০৩ পৃষ্ঠার একটি গ্রন্থ রচনা করেন যা হলো 'বাংলাদেশ দ্য টেস্ট কেস ফর ডেভেলপমেন্ট'। সেখানে তাঁরা বলেছিলেন, 'বাংলাদেশ হচ্ছে উন্নয়নের একটি পরীক্ষাক্ষেত্র। বাংলাদেশ যদি তার উন্নয়ন সমস্যার সমাধান করতে পারে, তাহলে বুঝতে হবে, যেকোনো দেশই উন্নতি করতে পারবে।' এ দু'অর্থনীতিবিদ আরও বলেছিলেন, "পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তান মিলে একটি ভালো অর্থনীতি গড়ে ওঠতে পারবে, আলাদা হয়ে বাংলাদেশ টিকে থাকতে পারবে না।

দ্বিতীয়ত, এ দেশে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার সব সময়ে অর্থনৈতিক অগ্রগতির তুলনায় বেশি থাকবে, ফলে অর্থনীতিতে প্রকৃত আয় কখনো বাড়বে না। আর দেশটি জন্ম থেকেই সাহায্যনির্ভর, যতদিন যাবে, এ নির্ভরতা বাড়তে থাকবে।" নরওয়ের ইয়ুস্ট ফালাব্দ ১৯৭৬ সালে তাঁর একটি লিখায় মন্তব্য করেন, 'বাংলাদেশ আসলে অর্থনীতিতে টিকে থাকতে পারবে না। আজীবনই বিদেশি সাহায্যের ওপর নির্ভর করে থাকতে হবে। International Economic Association এর সাবেক প্রেসিডেন্ট প্রখ্যাত অর্থনীতিবিদ অস্টিন রবিনসন হিসাব দিয়ে বলেছিলেন, বাংলাদেশকে মাথাপিছু আয় ৯০০ ডলারে নিতেই প্রয়োজন হবে ৯০ থেকে ১২০ বছর। ১৯৭১ সালে হেনরি কিসিঞ্জারসহ মার্কিন নীতিনির্ধারকেরা বাংলাদেশকে একটি 'তলাবিহীন ঝুড়ি' বা 'বটমলেস বাস্কেট' বলেছিলেন।

বাংলাদেশের অর্থনীতির গতিধারা

স্বাধীনতার ঠিক পরপরই দেশের অর্থনীতি কেমন ছিল? ১৯৭২ সালের ২৫ সেপ্টেম্বর বিশ্বব্যাংক একটি রিপোর্ট করেছিল যা হলো-'সবচেয়ে ভালো পরিস্থিতিতেও বাংলাদেশের উন্নয়ন সমস্যাটি অত্যন্ত জটিল। এখানকার মানুষ অত্যন্ত দরিদ্র, মাথাপিছু আয় ৫০ থেকে ৭০ ডলার এর মধ্যে, যা গত ২০ বছরে বাড়েনি, জনসংখ্যার প্রবল আধিক্য এখানে, প্রতি বর্গকিলোমিটারে ১ হাজার ৪০০ মানুষ বাস করে, তাদের জীবনের আয়ুষ্কাল অনেক কম, এখনো তা ৫০ বছরের নিচে, বেকারত্বের হার ২৫ থেকে ৩০ শতাংশের মধ্যে এবং জনসংখ্যার বড় অংশই অশিক্ষিত।' নরওয়ের বিখ্যাত অর্থনীতিবিদ জাস্ট ফাল্যান্ড এবং অন্য একজন অর্থনীতিবিদ জে. আর, পার্কিনসন ১৯৭৬ সালে দু'জনে ২০৩ পৃষ্ঠার একটি গ্রন্থ রচনা করেন যা হলো 'বাংলাদেশ দ্য টেস্ট কেস ফর ডেভেলপমেন্ট'। সেখানে তাঁরা বলেছিলেন, 'বাংলাদেশ হচ্ছে উন্নয়নের একটি পরীক্ষাক্ষেত্র। বাংলাদেশ যদি তার উন্নয়ন সমস্যার সমাধান করতে পারে, তাহলে বুঝতে হবে, যেকোনো দেশই উন্নতি করতে পারবে।' এ দু'অর্থনীতিবিদ আরও বলেছিলেন, "পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তান মিলে একটি ভালো অর্থনীতি গড়ে ওঠতে পারবে, আলাদা হয়ে বাংলাদেশ টিকে থাকতে পারবে না।

বাংলাদেশের অর্থনীতির গতিধারা

১৯৭১ সালে হেনরি কিসিঞ্জারসহ মার্কিন নীতিনির্ধারকেরা বাংলাদেশকে একটি 'তলাবিহীন ঝুড়ি' বা 'বটমলেস বাস্কেট' বলেছিলেন। কিন্তু বর্তমানে বাংলাদেশ একটি উন্নয়নশীল মিশ্র অর্থনীতির দেশ। স্বাধীনতা-উত্তর প্রথম সরকার যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশ পুনর্গঠন, আয় বৈষম্য দূরীকরণ, দারিদ্র্যের অভিশাপ হতে মুক্ত করার লক্ষ্যে সমাজতান্ত্রিক ভাবধারায় দেশ গঠনে মনোনিবেশ করলেও বার বার রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের মাধ্যমে বর্তমানে নিয়ন্ত্রিত ধনতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থা প্রচলিত রয়েছে। সরকারি ও বেসরকারি খাতে যৌথ অংশীদারিত্বের মাধ্যমে পরিচালিত উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের ফলে প্রবৃদ্ধির হার গত এক দশক যাবৎ ৬-৭ শতাংশের ঘরে ওঠানামা করছে। মাথাপিছু আয়, জীবনযাত্রায় মান, গড় আয়ু বৃদ্ধি পাচ্ছে।

দ্বিতীয়ত, এ দেশে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার সব সময়ে অর্থনৈতিক অগ্রগতির তুলনায় বেশি থাকবে, ফলে অর্থনীতিতে প্রকৃত আয় কখনো বাড়বে না। আর দেশটি জন্ম থেকেই সাহায্যনির্ভর, যতদিন যাবে, এ নির্ভরতা বাড়তে থাকবে।" নরওয়ের ইয়ুস্ট ফালান্দ ১৯৭৬ সালে তাঁর একটি লিখায় মন্তব্য করেন, 'বাংলাদেশ আসলে অর্থনীতিতে টিকে থাকতে পারবে না। আজীবনই বিদেশি সাহায্যের ওপর নির্ভর করে থাকতে হবে। International Economic Association এর সাবেক প্রেসিডেন্ট প্রখ্যাত অর্থনীতিবিদ অস্টিন রবিনসন হিসাব দিয়ে বলেছিলেন, বাংলাদেশকে মাথাপিছু আয় ৯০০ ডলারে নিতেই প্রয়োজন হবে ৯০ থেকে ১২০ বছর।"

বাংলাদেশের অর্থনীতির গতিধারা

নিম্নে বাংলাদেশের অর্থনীতির গতিধারা তুলে ধরা হলো:

১. অর্থের সরবরাহ: স্বাধীনতা-উত্তর বাংলাদেশের সূচনালগ্নে ১৯৭১ সালের ১৭ ডিসেম্বর দেশে অর্থের সরবরাহ ছিল ৫৪৬.০২ কোটি টাকা। ১৯৭৫ সালের জুন মাসে অর্থের যোগানের পরিমাণ (ব্যাপক মুদ্রা M_2) দাঁড়ায় ১,৩০২.৪০ কোটি টাকা এবং ফেব্রুয়ারি ২০২৪০। শেষে হয় ১৯,১৯,৮০৫.৬ কোটি টাকা।

২. জনসংখ্যা: জনসংখ্যাও সময়ের সাথে দ্রুত বৃদ্ধি পেতে থাকে। নিম্নের সারণিতে জনসংখ্যার গতিধারা তুলে ধরা হলো:

বছর	জনসংখ্যা (কোটি)
১৯৭৪	৭.৬৪
১৯৮১	৮.৯৯
১৯৯১	১১.১৪
২০০১	১৩.১৫
২০১৫–১৬	১৫.৮৯
২০২৩	১৭.১০

বাংলাদেশের অর্থনীতির গতিধারা

৩. শ্রমশক্তি ও কর্মসংস্থান: ১৯৯৫/৯৬ সালে কৃষি, শিল্প ও সেবাখাতে নিয়োজিত শ্রমিকের হার ছিল যথাক্রমে ৬৩.২, ৭.৫ এবং ১২.০ শতাংশ যা ২০২৩ সালের লেবার ফোর্স সার্ভে অনুযায়ী কৃষিখাতে নিয়োজিত শ্রমিকের হার ৪৫.০০ শতাংশ এবং অকৃষিখাতে নিয়োজিত শ্রমিকের হার ৫৫.০০ শতাংশ। ২ তথ্য হতে লক্ষ্য করা যায়, কৃষিতে নিয়োজিত শ্রমিকের হার হ্রাস পেলেও শিল্প ও সেবাখাতে নিয়োজিত শ্রমিকের হার বৃদ্ধি পেয়েছে।

৪. কৃষি উৎপাদন: কৃষি উৎপাদনের গতিধারা খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। বাংলাদেশ কৃষিখাতে অভাবিত সাফল্য অর্জন করেছে। জনসংখ্যা বৃদ্ধির সাথে সাথে আবাদযোগ্য জমির পরিমাণ হ্রাস পেলেও অত্যাধুনিক প্রযুক্তির সহায়তায় কৃষি উৎপাদন অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে।

খাদ্যশস্য উৎপাদন (লক্ষ মে. টন)

বছর	১৯৮০–৮১	১৯৯০–৯১	২০১৯–২০	২০২২–২৩	২০২৩–২৪*
মোট খাদ্যশস্য	১৪৯.৭	১৮৮.৬	৪৫৩.৪৪	৪৬৭.০৪	৫১৩.৪৫

বা. অর্থ. সমীক্ষা-১৯৯৭, ২০২৪ * লক্ষ্যমাত্রা

বাংলাদেশের অর্থনীতির গতিধারা

৫. শিল্প উৎপাদন বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে শিল্পখাতের অবদান এবং উন্নয়নের গতিধারা অত্যন্ত আশাব্যঞ্জক। অর্থনীতির আধুনিকায়ন ও কাঠামোগত রূপান্তর, অর্থনৈতিক ভিত্তির বৈচিত্র্যায়ন, ক্রমবর্ধমান উৎপাদনশীলতা অর্জন, প্রযুক্তিগত অগ্রগতি, বাহ্যিক ব্যয় সংকোচন, ত্বরিত অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জন, কর্মসংস্থান সৃষ্টি এবং জনগণের আয় ও জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন-এসব ক্ষেত্রে শিল্প উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করছে।

ক্ষুদ্র ও কুটিরশিল্প, মাঝারি থেকে বৃহৎশিল্প তথা মোট শিল্পখাত (ম্যানুফ্যাকচারিং) হতে উৎপাদন (জিডিপি) ও প্রবৃদ্ধির হার :

বছর	১৯৯১–৯২	১৯৯৫–৯৬	২০২২–২৩	২০২৩–২৪*
মোট প্রাপ্তি (কোটি টাকায়)	৫৪১১.৭ (৭.৩)	৭২৮২.৩ (৫.৩)	১১,৬৮,৫৪৯ (৮.৩৭)	১২,৪৬,৩৮৬ (৬.৬৬)

(বন্ধনীর ভেতর শতকরা প্রবৃদ্ধির হার) * সাময়িক

বাংলাদেশের অর্থনীতির গতিধারা

৬. সঞ্চয়-বিনিয়োগ (জিডিপি'র শতকরা হার) : সঞ্চয় ও বিনিয়োগ খাতেও পরিবর্তনের ধারা সচল ছিল। যেমন :

বছর	১৯৯৬–৯৭	২০২৩–২৪*
দেশজ সঞ্চয়	৭.৭	২৭.৬১
জাতীয় সঞ্চয়	১৪.৪	৩১.৮৬
মোট বিনিয়োগ	১৭.৪	৩০.৯৮
সরকারি বিনিয়োগ	৬.৫	৭.৪৭
বেসরকারি বিনিয়োগ	১০.৯	২৩.৫১

বা. অর্থ. সমীক্ষা-১৯৯৭, ২০২৪ * সাময়িক

গত দেড় দশকে অভ্যন্তরীণ ও জাতীয় সঞ্চয় এবং বিনিয়োগ বৃদ্ধি পেয়েছে। এক্ষেত্রে সরকারি খাত অপেক্ষা বেসরকারি খাতের অবদান ছিল বেশি।

বাংলাদেশের অর্থনীতির গতিধারা

৭. **অর্থনৈতিক খাত :** দেশজ উৎপাদনে বাংলাদেশের সার্বিক খাতসমূহের অবদানের কাঠামোগত পরিবর্তন ও প্রবৃদ্ধির ধারা নিম্নের সূচিতে তুলে ধরা হলো :

খাতসমূহ	অবদান (শতকরা হার)					
	১৯৮০–৮১	১৯৯০–৯১	২০০০–০১	২০১২–১৩	২০২১–২২	২০২৩–২৪*
কৃষি	৩৩.০৭	২৯.২৩	২৫.০৩	১৬.৭৮	১১.৬১	১১.০২
শিল্প	১৭.৩১	২১.০৪	২৬.২০	২৯.০০	৩৬.৯২	৩৭.৯৫
সেবা	৪৯.৬২	৪৯.৭৩	৪৮.৭৭	৫৪.২২	৫১.৪৮	৫১.০৪
মোট	১০০.০০	১০০.০০	১০০.০০	১০০.০০	১০০.০০	১০০.০০

* সাময়িক

ওপরের টেবিল হতে দেখা যাচ্ছে যে, গত চার দশকে বাংলাদেশে জিডিপিতে কৃষিখাতের অবদান ক্রমান্বয়ে হ্রাস পেয়েছে এবং শিল্পখাতের অবদান ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পেয়েছে। তবে সেবাখাতের অবদান প্রায় একই রয়েছে।

৮. বিদ্যুৎ উৎপাদন ১৯৯৭ সালে দেশে বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা ছিল ২৯০৮ মেগাওয়াট, উৎপাদন হতো ১৬০০-১৮০০ মেগাওয়াট। বিদ্যুৎ খাতে সরকারের গৃহীত তাৎক্ষণিক, স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা পর্যায়ক্রমে বাস্তবায়নের ফলে সরকারি খাতে ১১,১৭০ মেগাওয়াট, যৌথ উদ্যোগে ১,৮৬১ মেগাওয়াট, বেসরকারি খাতে ১১,১৫৭মেগাওয়াট, ২,৬৫৬ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ আমদানি এবং ক্যাপটিভ ও নবায়নযোগ্য জ্বালানিসহ মোট স্থাপিত উৎপাদন ক্ষমতা ৩০,০৬৭ মেগাওয়াট। বিদ্যুৎ চাহিদার বিপরীতে এ পর্যন্ত সর্বোচ্চ ১৬,২৩৩ মেগাওয়াট (২২ এপ্রিল ২০২৪) বিদ্যুৎ উৎপাদিত হয়েছে।

৯. গ্যাস ও জ্বালানি: প্রাকৃতিক গ্যাস বাংলাদেশের একটি অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ জ্বালানি সম্পদ যা দেশের মোট বাণিজ্যিক জ্বালানি ব্যবহারের শতকরা প্রায় ৫৪-৫৯ ভাগ পূরণ করে। দেশে আবিষ্কৃত ২৯টি গ্যাস ক্ষেত্রে মোট প্রাক্কলিত গ্যাস মজুদের পরিমাণ ছিল ৪০.৫৩ ট্রিলিয়ন ঘনফুট। এর মধ্যে উত্তোলনযোগ্য প্রমাণিত ২৮.৮৯ ট্রিলিয়ন ঘনফুট; ব্যবহারের পর ডিসেম্বর ২০২৩ সময়ে নিট মজুদের পরিমাণ দাঁড়ায় ১০.১৭ ট্রিলিয়ন ঘনফুট। সরকার প্রাকৃতিক গ্যাসের ওপর অধিক মাত্রায় নির্ভরশীলতা কমানোর লক্ষ্যে কয়লা, ডুয়েল ফুয়েল ও পারমাণবিক শক্তির মাধ্যমে বিদ্যুৎ উৎপাদনের পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। এ লক্ষ্যে নবায়নযোগ্য জ্বালানি সংক্রান্ত বিভিন্ন কার্যক্রম বাস্তবায়ন হচ্ছে। টেকসই জ্বালানিব্যবস্থা সুসংহত করার লক্ষ্যে জ্বালানি দক্ষতা বৃদ্ধি এবং ২০৩০ সালের মধ্যে ২০ শতাংশ জ্বালানি সাশ্রয়ের লক্ষ্যমাত্রা ধার্য্য করা হয়েছে।

THANK YOU

HSC
একাডেমিক কোর্স

অর্থনীতি ২য় পত্র

অধ্যায় ০১ : বাংলাদেশের অর্থনীতি পরিচয়

টপিক – ০৯ বৈশ্বিক পরিপ্রেক্ষিতে বাংলাদেশের অবস্থান এবং ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা

বৈশ্বিক পরিপ্রেক্ষিতে বাংলাদেশের অবস্থান এবং ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা

This Topic is important for

MCQ	সৃজনশীল
	ক খ
	গ ঘ

বৈশ্বিক পরিপ্রেক্ষিতে বাংলাদেশের অবস্থান এবং ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা

বর্তমান যুগ বিশ্বায়নের (Globalization) যুগ। বিশ্বায়ন হচ্ছে এমন একটি প্রক্রিয়া যা অধিক জনগণের মধ্যে অবাধ পারস্পরিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার দ্বারা মূলধন বাজারের সমন্বয়ে পণ্য ও সেবার অবাধ লেনদেনকে বোঝায়। এর ফলে পৃথিবীব্যাপী অধিক বাজার, অধিক ব্যবসায় এবং অধিক অর্থনীতির মধ্যে প্রযুক্তির মাধ্যমে যোগাযোগ ঘটে। ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন এ প্রসঙ্গে বলেন, Globalization is the process by which interaction between more people and therefore between more business, more markets and more economics around the world-is being enabled through technology. বিশ্বায়ন প্রকৃতপক্ষে বিশ্বব্যাপী বিভিন্ন দেশ ও জাতিসমূহের আত্মনির্ভরশীলতা (interdependency) বোঝায়। বৈশ্বিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার ফলে যেসব সুযোগ সৃষ্টি হতে পারে, তা হলো- * বিনিয়োগ বৃদ্ধি (Increased Investment) * অধিক কর্মসংস্থান (More Employment) * অধিক উৎপাদন (More Production) * মাথাপিছু আয় বৃদ্ধি (Increased per Capita income) * জীবনের মানোন্নয়ন (Improved living standard) * সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন (Improved Social Conditions) * নতুন প্রযুক্তির (Technology) উদ্ভব * জনশক্তি (Manpower) * মানবসম্পদ উন্নয়ন * শিল্পায়ন ও নির্ভরযোগ্য উন্নয়ন (Industrialization & Sustainable development) * পরিবেশ সুরক্ষা (Environmental Protection) ।

বাংলাদেশের বর্তমান অবস্থান'

বৈশ্বিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার ফলাফল সর্বদাই অনুকূল বা সন্তোষজনক থাকে না। ২০০৮ সাল থেকে যুক্তরাষ্ট্র ও ইউরোপীয় ইউনিয়নভুক্ত দেশসহ উন্নত দেশগুলোতে মন্দা শুরু হয়। উক্ত দেশ ও অঞ্চলের ওপর নির্ভরশীল দরিদ্র ও উন্নয়নশীল দেশগুলোতেও উক্ত মন্দার অভিঘাত পড়ে। বিশ্বায়নের ফলে এ ধরনের আঞ্চলিক অর্থনৈতিক অস্থিরতা সমগ্র বিশ্বকেই আন্দোলিত করে।

বৈশ্বিকভাবে, আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিলের (IMF) পরিসংখ্যানের ভিত্তিতে তৈরি বিশ্বের ৫০টি বৃহত্তম অর্থনীতির দেশের তালিকায় ৪৬৫ বিলিয়ন ডলার জিডিপি নিয়ে ২০২২ সালের শেষে বাংলাদেশের অবস্থান এর পূর্বের বছরের (৩৯৭ বিলিয়ন ডলার; ৪১তম) তুলনায় এগিয়ে ৩৫তম হয়েছে।*। ২০৩০ সালে ২৬তম বৃহৎ অর্থনীতির দেশে পরিণত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। বাংলাদেশের তৈরি পোশাক ও হোসিয়ারি, হিমায়িত খাদ্য চিংড়ি, চামড়াসহ রপ্তানির বৃহত্তম অংশ যুক্তরাষ্ট্র ও ইউরোপীয় ইউনিয়নভুক্ত দেশসমূহে রপ্তানি হয়।

বৈশ্বিক পরিপ্রেক্ষিতে বাংলাদেশের অবস্থান এবং ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা

বিশ্বব্যাপী এ অর্থনৈতিক মন্দার (Global Economic Meltdown) সময়ে বাংলাদেশের কৃষিখাতের শক্তিশালী ধারাবাহিক প্রবৃদ্ধি অর্জন, বিভিন্ন দেশ ও অঞ্চলের সাথে অর্থনৈতিক জোট গঠন এবং ইউরোপীয় ইউনিয়নসহ বিভিন্ন দেশের সাথে GSP (Generalized System of Preferences) বা কোটা সুবিধা বিদ্যমান থাকায় পোশাকশিল্পের রপ্তানি আয় সম্প্রসারণ, রপ্তানিতে বৈচিত্র্য আনায়ন-চামড়া ও চামড়াজাত পণ্য, পাট ও পাটজাত পণ্য; প্রসাধন; হস্ত ও কুটিরশিল্প; কৃষিজাত পণ্য; কম্পিউটার, বৈদ্যুতিক ও ইলেক্ট্রনিক্স পণ্য; ঔষধশিল্প, মৎস্য প্রভৃতি রপ্তানি তালিকায় যুক্ত হয়েছে। এছাড়া সময়োপযোগী আর্থিক ও' রাজস্বনীতি বাস্তবায়নের ফলে রাজস্ব আদায়ের উচ্চহার, মূল্যস্ফীতিকে নিয়ন্ত্রণে রাখার চেষ্টা, উচ্চ বাজেট ব্যবস্থাপনা, প্রণোদনা প্যাকেজ বাস্তবায়ন, রেমিট্যান্স প্রবাহ শক্তিশালী করার

লক্ষ্যে নতুন নতুন শ্রমবাজার অনুসন্ধানে পদক্ষেপ গ্রহণ ও বাস্তবায়ন প্রভৃতি কারণে বৈশ্বিক মন্দা বাংলাদেশের সামগ্রিক অর্থনীতিকে তেমন ক্ষতিগ্রস্ত করতে পারেনি। বিশ্বের ১৭০টি দেশে বাংলাদেশি কর্মী ছাড়পত্র - নিয়ে গমন করেছে। বিভিন্ন দেশে কর্মী প্রেরণের চাহিদা নিরূপণের জন্য ৫৩টি সম্ভাব্য দেশে শ্রমবাজার গবেষণা করা হয়েছে। ইতোমধ্যেই অস্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যান্ড, কানাডা, সুইডেন, কম্বোডিয়া, সেসেলস, বসনিয়া ও হারজেগোভিনা, রোমানিয়া, হাঙ্গেরি, পোল্যান্ড, উজবেকিস্তান এবং চীনে নতুন শ্রমবাজার সম্প্রসারিত হচ্ছে। এছাড়া সরকার বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও অবকাঠামো খাতে ব্যাপক সংস্কার কর্মসূচি গ্রহণের মাধ্যমে উৎপাদন ও বিনিয়োগ ক্ষেত্রে ইতিবাচক পরিবর্তন সাধনে সচেষ্ট রয়েছে। নানা প্রতিকূলতা সত্ত্বেও, বিশেষ করে এক দশক ধরেই এদেশে দ্রুত প্রবৃদ্ধি হচ্ছে। ২০১৮-১৯ অর্থবছরে বাংলাদেশের জিডিপি প্রবৃদ্ধি হয়েছে ৮.১৫ শতাংশ। ২০১৫-১৬ অর্থবছরের পর দেশের প্রবৃদ্ধি ৭ শতাংশের নিচে হয়নি। তবে কোভিড-১৯ এর ফলে ২০১৯-২০ ও ২০২০-২১ অর্থবছরে এবং ইউক্রেন যুদ্ধের ফলে ২০২১-২২ অর্থবছরে বাংলাদেশের প্রবৃদ্ধি কম হলেও অনেক উন্নত দেশসমূহের তুলনায় অধিক ছিল। এরূপ বৈশ্বিক সম্পর্ক অর্থনীতির বিভিন্ন খাতকে প্রত্যক্ষ অথবা পরোক্ষভাবে প্রভাবিত করেছে।

ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা**

জনবহুল, দারিদ্র্যপীড়িত বাংলাদেশ বিশ্বায়নের অপার সম্ভাবনার সুযোগকে কাজে লাগিয়ে অর্থনৈতিক অগ্রগতি সাধনে নিয়োজিত হতে পারে। যেমন-

(i) বাস্তবমুখী বিজ্ঞানমনস্ক শিক্ষায় জাতিকে শিক্ষিত করার মাধ্যমে মানবসম্পদের গুণগতমান বৃদ্ধি করে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা যায়।

(ii) বাংলাদেশ কৃষিনির্ভর দেশ। শিল্পের প্রয়োজনীয় কাঁচামালের জন্য কৃষির ওপর নির্ভর করতে হয়। তাই বাংলাদেশে কৃষিনির্ভর শিল্পায়নের যথেষ্ট সম্ভাবনা বিদ্যমান।

(iii) দ্রুত অর্থনৈতিক উন্নয়নের লক্ষ্যে সরকার কৃষিক্ষেত্রে ভর্তুকি, শিল্পাঞ্চল গঠন, আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের বাধা হিসেবে বিভিন্ন দেশের সাথে শুল্ক বাধা রহিতকরণসহ উন্নয়নমুখী নানা পদক্ষেপ গ্রহণ করছে।

(iv) অভ্যন্তরীণ উৎপাদন ক্ষেত্রেও দক্ষতা বৃদ্ধির মাধ্যমে পণ্যের গুণগতমান বৃদ্ধি এবং ব্যয় হ্রাসের মাধ্যমে বিশ্ব বাজারে প্রবেশ করে মুনাফা বৃদ্ধির সুযোগ রয়েছে।

(v) শ্রমবাজার অনুসন্ধান, সম্পর্ক উন্নয়নের মাধ্যমে অদক্ষ, আধাদক্ষ, দক্ষ শ্রমশক্তি রপ্তানি করে; বাংলাদেশের সস্তা শ্রমবাজারে বৈদেশিক বিনিয়োগ আকর্ষণ করে জনগণের জীবনের মানোন্নয়ন সাধন করা সম্ভব।

(vi) বাংলাদেশের মতো উন্নয়নশীল দেশগুলো ক্ষুদ্র, মাঝারি ও বৃহৎশিল্পের উন্নয়ন বা বিকাশের জন্য উন্নত দেশসমূহ হতে মূলধনী দ্রব্য (Capital Goods) আমদানি করতে পারে।

(vii) বিশ্বব্যাপী পরিবেশ দূষণ, গ্রিন হাউস গ্যাস নির্গমন ও জলবায়ু পরিবর্তনজনিত ঝুঁকি মোকাবেলায় বাংলাদেশের প্রধান অর্থকরী ফসল সোনালী আঁশ নামে পরিচিত পাট ও পাটজাত দ্রব্যের ব্যবহার বা পরিবেশবান্ধব পণ্যের বাজার সম্প্রসারণের সুবিধা বিদ্যমান।

(viii) শ্রমবহুল বাংলাদেশের সস্তা শ্রম ও দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতার মাধ্যমে তৈরি পোশাকের বিশ্ববাজার অনেক সম্ভাবনাময় এবং প্রতিযোগিতামূলকভাবে বিশ্বে এটি একটি ব্র্যান্ডিং হতে পারে।

(ix) সম্ভাবনাময় পোশাকশিল্পকে আরো বিকশিত করতে হলে এ শিল্পে ব্যবহৃত তুলা, সুতা, বস্ত্র তথা ব্যাকওয়ার্ড এবং ফরোয়ার্ড লিংকেজ শিল্পের বিকাশ সাধন করার সুযোগ রয়েছে।

(x) ভবিষ্যৎ সময়ের চাহিদার আলোকে কাঠামোগত রূপান্তরের মাধ্যমে উদার শিল্পনীতি-২০১৬ প্রণয়ন এবং বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। এর ফলে দেশে পরিকল্পিতভাবে শিল্পের অব্যাহত ও টেকসই উন্নয়ন সম্ভব হবে এবং বেকারত্ব হ্রাসসহ দারিদ্র্য দূরীকরণ সম্ভব হবে।

(xi) সরকার কৃষি, শিল্প, শিক্ষা, সনাতনী এবং নবায়নযোগ্য জ্বালানি ব্যবস্থার উন্নয়ন, অবকাঠামো উন্নয়ন, প্রতিরক্ষা, ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণ ও দারিদ্র্য দূরীকরণ প্রভৃতি ক্ষেত্রেই দীর্ঘমেয়াদি, মধ্যমেয়াদি এবং তা বাস্তবায়নে স্বল্পমেয়াদি পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করছে। এ পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করা সম্ভব হলে অফুরন্ত সম্ভাবনার দ্বার উন্মোচন হবে।

(xii) প্রাকৃতিক সম্পদে সমৃদ্ধ বাংলাদেশের স্থলভাগ, অগভীর ও গভীর সমুদ্রাঞ্চল। রয়েছে চট্টগ্রাম, মংলা ও পায়রা সমুদ্রবন্দর। নির্মিত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে গভীর সমুদ্রবন্দর, আঞ্চলিক, উপ-আঞ্চলিক এবং আন্তর্জাতিক সড়ক ও রেল যোগাযোগব্যবস্থা। ২০১৮ সালে প্রথম মহাকাশে গিয়েছে বাংলাদেশের নিজস্ব 'বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট'-১। যোগাযোগব্যবস্থার উন্নয়নে এটি এক যুগান্তকারী পদক্ষেপ। এসবই বাংলাদেশের অর্থনীতির জন্য উজ্জ্বল সম্ভাবনা সৃষ্টি করেছে।

(xiii) ভারত, ভুটান, নেপাল, মিয়ানমার, চীনসহ এ অঞ্চলের বিভিন্ন দেশের সাথে যাতায়াত ও যোগাযোগব্যবস্থা সম্প্রসারণের মাধ্যমে, বিদ্যুৎ, জ্বালানি, কৃষি ও শিল্পখাতে প্রভূত উন্নয়নের সুযোগ রয়েছে।

আশঙ্কা / অনিশ্চয়তা

কোভিড-১৯ অতিমারির অভিঘাত মোকাবেলা করে অর্থনীতি যখন পুনরুদ্ধারের দিকে যাচ্ছে তখনই ইউক্রেন-রাশিয়ার যুদ্ধ সমগ্র বিশ্বে এক মহাসংকট তৈরি করেছে। অষ্টম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা, এসডিজি, দ্বিতীয় প্রেক্ষিত পরিকল্পনা ২০২১-৪১;

ডেল্টা পরিকল্পনা ২১০০ এবং 'সুনীল অর্থনীতি'র কৌশলসমূহ বাস্তবায়ন বর্তমান পরিস্থিতিতে কিছুটা চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হয়েছে। বর্তমানে খাদ্য ও জ্বালানি সংকট, বেকারত্ব, তীব্র মুদ্রাস্ফীতি পৃথিবীর প্রত্যেকটি দেশ ও অঞ্চলকে হুমকিতে ফেলেছে।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ঘোষিত সময়োপযোগী ও কার্যকর অর্থনৈতিক পুনরুদ্ধার কার্যক্রম বাস্তবায়নের মাধ্যমে সরকার কর্মসৃজন ও কর্মসুরক্ষা, করোনা মহামারী ও ইউরোপের যুদ্ধের অর্থনৈতিক প্রভাবকে কাটিয়ে ওঠতে যথেষ্ট উদ্যোগী ভূমিকা নিয়েছে। এক্ষেত্রে দেশের জনগণেরও সচেতনভাবে ভূমিকা রাখার সুযোগ রয়েছে। বিলাসিতাকে নিয়ন্ত্রণে রেখে অপচয় রোধ করে এরূপ সহযোগিতা করা যায়। সরকার বিশ্বাস করে, Every challenge creates lots of opportunities and windows for moving forward.

THANK YOU

HSC
একাডেমিক কোর্স

অর্থনীতি ২য় পত্র

অধ্যায় ০১ : বাংলাদেশের অর্থনীতি পরিচয়

টপিক – ১০ বহুনির্বাচনী প্রশ্ন সমাধান

বহুনির্বাচনী প্রশ্ন সমাধান

১. হিমালয় হতে বঙ্গোপসাগর পর্যন্ত এ অঞ্চলের উত্তর অংশ কোনটি?
(ক) বরেন্দ্র ও পুত্র (খ) হরিকেল ও সমতট (গ) বঙ্গাল (ঘ) রাঢ় ও তাম্রলিপ্তি

২. কত সালে জমিদারি প্রথা/চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রথা বিলুপ্ত হয়?
(ক) ১৯৪৭ (খ) ১৯৪৮ (গ) ১৯৫০ (ঘ) ১৯৬৯

৩. বাংলাদেশের ভৌগোলিক আয়তন হলো-
(ক) ১,৪৭,৫৭০ বর্গ কি.মি. (খ) ১,৪৯,৫৭০ বর্গ কি.মি.
(গ) ১,৫১,৫৭০ বর্গ কি.মি. (ঘ) ১,৫৫,৫৭০ বর্গ কি.মি.

[৪. বাংলার অর্থনৈতিক ইতিহাসের স্বর্ণযুগের সময়কাল কোনটি? [রা. বো. '১৯]
(ক) ১২০০ সাল পর্যন্ত (খ) ১২০০-১৭৫৭ খ্রি. (গ) ১৭৫৭-১৯৪৭ খ্রি. (ঘ) ১৯৪৭-১৯৭১ খ্রি.

৫. কোন যুগে বাংলায় প্রথম মুদ্রা প্রচলন হয়?
(ক) প্রাচীন যুগ (খ) মুসলিম যুগ (গ) ইংরেজ যুগ (ঘ) পাকিস্তান যুগ

৬. উৎপাদনের ভিত্তিতে বাংলাদেশের অর্থনীতির খাতসমূহ কয় ভাগে বিভক্ত? [ব. বো. '১৯]
(ক) ২ (খ) ৩ (গ) ৪ (ঘ) ৫

৭. মুসলিম যুগের অর্থনীতির সময়কাল-
(ক) ১২০০-১৭৫৭ (খ) ১২০০-১৮৫৭ (গ) ১৭৫৭-১৮৫৭ (ঘ) ১৭৫৭-১৯৪৭

বহুনির্বাচনী প্রশ্ন সমাধান

৮. কোন যুগে বাংলায় কৃষি অর্থনীতির প্রাধান্য লক্ষ্য করা যায়? [চ. বো. '১৯]

(ক) মুসলিম যুগ (খ) প্রাচীন যুগ (গ) ইংরেজ যুগ (ঘ) পাকিস্তান যুগ

৯. কত সাল পর্যন্ত সময়কে আদি ও হিন্দু যুগ বলা হয়ে থাকে?

(ক) ১২০০ (খ) ১৩২০ (গ) ১৭০৭ (ঘ) ১৮৫৮

১০. স্বাধীনতার পূর্বে বাংলাদেশের অর্থনীতির ঐতিহাসিক পটভূমি কয়ভাগে বিভক্ত ছিল?

(ক) ৩ (খ) ৪ (গ) ৫ (ঘ) ৬

১১. বাংলাদেশের প্রধান খনিজসম্পদ কোনটি?

(ক) প্রাকৃতিক গ্যাস (খ) খনিজ তেল (গ) কয়লা (ঘ) চুনাপাথর

১২. মুসলিম যুগের অর্থনীতির মধ্যে অন্তর্ভুক্ত কোনটি?

(ক) ১৭২৮ খ্রিষ্টাব্দ (খ) ১৭৬৮ খ্রিষ্টাব্দ (গ) ১৭৬৯ খ্রিষ্টাব্দ (ঘ) ১৭৭০ খ্রিষ্টাব্দ

১৩. কখন ইংরেজরা এ ভূখণ্ডে স্বাধীনভাবে ব্যবসা করার সুযোগ পায়?

(ক) ১৬১৫ খ্রিষ্টাব্দ (খ) ১৬৩২ খ্রিষ্টাব্দ (গ) ১৬৩৮ খ্রিষ্টাব্দ (ঘ) ১৬৫১ খ্রিষ্টাব্দ

THANK YOU

HSC
একাডেমিক কোর্স

অর্থনীতি ২য় পত্র

অধ্যায় ০১ : বাংলাদেশের অর্থনীতি পরিচয়

টপিক – ১১ সৃজনশীল প্রশ্ন সমাধান

সৃজনশীল প্রশ্ন সমাধান

১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে বিজয় অর্জনের পর থেকেই বাংলাদেশ ক্রমাগত উন্নয়নের দিকে ধাবিত হচ্ছে। GDP এর প্রবৃদ্ধি আশানুরূপ হচ্ছে। জীবনযাত্রার মান, শিক্ষার হার, নারী শিক্ষা, নারীর ক্ষমতায়ন বৃদ্ধি পাচ্ছে। দেশটির ভূ-প্রকৃতি, ভৌগোলিক অবস্থান, নদ-নদী, মৃত্তিকাসহ অন্যান্য প্রাকৃতিক উপাদানগুলো দেশটির উন্নয়নে সহায়তা করছে। আশা করা যায়, এ ধারা অব্যাহত থাকলে বাংলাদেশ ২০৩০ সালের মধ্যে উন্নত দেশে পরিণত হবে।[রা. বো. '১৯]

ক. উন্নয়নশীল দেশ বলতে কী বুঝ?

খ. অনুন্নত ও উন্নয়নশীল দেশের মধ্যে ২টি পার্থক্য লেখ।

গ. বাংলাদেশ উন্নয়নশীল দেশ কিনা উদ্দীপকের আলোকে ব্যাখ্যা করো।

ঘ. উদ্দীপকে উল্লেখিত উপাদানগুলো উন্নয়নে কীভাবে ভূমিকা রাখছে-বিশ্লেষণ করো।

সৃজনশীল প্রশ্ন সমাধান

সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজ শাসকেরা ২০০ বছর এ উপমহাদেশ শাসন ও শোষণ করেছে। এরপর পাকিস্তান সরকার আজকের বাংলাদেশকে শাসন ও শোষণ করেছে ২৪ বছর। তাদের উভয়ের উন্নয়নের জন্য প্রয়োজনীয় পুঁজির ব্যবহার হয়েছে এ অঞ্চলের লুণ্ঠিত সম্পদ। কিন্তু এ অঞ্চলের জনগণের উন্নয়নের জন্য বরাদ্দ ছিল খুব সামান্য। পরবর্তীতে দীর্ঘ নয় মাস রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের ফলে স্বাধীন হয় বাংলাদেশ নামের ভূখণ্ডটি। সাম্প্রতিক বাংলাদেশে কিছু পরিবর্তন সূচিত হয়েছে। যেমন, কৃষির কাঠামোগত পরিবর্তন, শিল্প ও সেবাখাতের ভূমিকা, শিক্ষার হার বৃদ্ধি, সমুদ্র জয়, তথ্য ও প্রযুক্তির সম্প্রসারণ, রেমিট্যান্স বৃদ্ধি এবং শিশু মৃত্যুর হার হ্রাস প্রভৃতি। [চ. বো. '১৯]

ক. অর্থনৈতিক অবকাঠামো কী?

খ. কোন যুগকে বাংলার ইতিহাসে 'স্বর্ণযুগ' বলা হয়? কেন?

গ. উদ্দীপকের আলোকে ঔপনিবেশিক শাসন ও শোষণের প্রকৃতি ব্যাখ্যা করো।

ঘ. বাংলাদেশ মধ্যম আয়ের দেশে পদার্পণের সম্ভাবনা তুমি কীভাবে মূল্যায়ন করবে?

সৃজনশীল প্রশ্ন সমাধান

অর্থনীতির শিক্ষক আসাদ সাহেব বাংলাদেশের অর্থনৈতিক কাঠামোর ওপর আলোকপাত করতে গিয়ে ছাত্রদের উদ্দেশ্যে বললেন, "সমষ্টিগত অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের ভিত্তি হচ্ছে অর্থনৈতিক কাঠামো। বাংলাদেশের অর্থনৈতিক কাঠামোকে তিন ভাগে ভাগ করা যায়; যথা: উৎপাদনভিত্তিক, মালিকানাভিত্তিক এবং অঞ্চলভিত্তিক। তবে শক্তিশালী অর্থনৈতিক অবকাঠামো ব্যতীত অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড বেগবান হয় না। অর্থনৈতিক অবকাঠামো হচ্ছে, একটি দেশের অর্থনীতির বুনিয়াদ।"
[কু. বো. '১৯]

ক. অর্থনৈতিক কাঠামো কী?

খ. বাংলাদেশের প্রাকৃতিক পরিবেশ কীভাবে অর্থনৈতিক উন্নয়নের অনুকূল?

গ. উদ্দীপকে বর্ণিত খাতগুলোর অধীনে বিদ্যমান উপখাতগুলোর সমন্বয়ে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক কাঠামোর একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও।

ঘ. "অর্থনৈতিক অবকাঠামো একটি দেশের অর্থনীতির বুনিয়াদ"-তুমি কি আসাদ সাহেবের এ বক্তব্যের সাথে একমত? তোমার উত্তরের সপক্ষে যুক্তি দাও।

THANK YOU